পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - বরুন রেজ
স্ক্যান করেছেন - বরুন রেজ
এডিট করেছেন - অপ্তিমাস প্রাইম

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

optifmcybertron@gmail.com

dhulokhela@gmail.com

ডিরেক্টর বাহাদুর কর্তৃক সমগ্র প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের লাইব্রেরীর জন্য অনুমোদিত

বাংলা ১৩২৯ সাল
প্রতিষ্ঠাতা
স্বর্গত
আশুতোষ ধর

সচিত্র মাসিক

শিশুসাথী

ইং ১৯২২ সন
৪৭শ বর্ষ
ফাল্গুন সংখ্যা
১৩৭৫

বার্ষিক মূল্য ৬৲ টাকা]

সূচী

[প্রতি সংখ্যা '৬০ পয়সা

	বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
১।	নদের নিমাই (কবিতা)	শ্রীবিনয় বাগচী	৬৬৭
২।	বেনগাজীর আখড়া	শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর	৬৬৮
৩।	ফাল্গুন এলো (কবিতা)	শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ভৌমিক	৬৭৩
৪।	বসন্ত ওই আসে (নাটিকা)	স্বপনবুড়ো	৬৭৪
৫।	একটি অবিস্মরণীয় মৃত্যু	শ্রীশৈলেন দত্ত	৬৭৮

অস্বস্তিকর কাশি নিরাময় করে বা স ক

প্রাচীন কাল হইতে বাসকের কফ নিঃসারক ও আক্ষেপ নিবারক গুণ সুবিদিত। গোলমরিচ ও পিপুল সংযোগে এই গুণ বহু পরিমাণে বর্ধিত হইয়াছে। নিয়মিত সেবনে কাশি দমন হয় ও কফ তরল হইয়া সহজেই নির্গত হয়। শ্বাস কষ্টের লাঘব করিয়া শ্বাস যন্ত্রকে স্নিগ্ধ রাখে। বৃদ্ধ ও শিশু সকলের পক্ষে সমান উপকারী।

বেঙ্গল
কেমিক্যালের
বাসক

বেঙ্গল
কেমিক্যাল
কলিকাতা বোম্বাই কানপুর

সূচী

	বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
৬।	পায়রা মটরওয়ালার মেয়ে	শ্রীতারাপদ রাহা	৬৮৩
৭।	চাঁদ পড়েছে ফাঁদে (কবিতা)	শ্রীনবগোপাল সিংহ	৬৯০
৮।	বীজ থেকে	শ্রীচুণীলাল রায়	৬৯১
৯।	পুরস্কার	শ্রীমদন চৌধুরী	৬৯৩
১০।	তিন সত্যি ঃ টিক্ টিক্ টিক্ (কবিতা)	শ্রীভুবনেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়	৬৯৬
১১।	পুরাণের পাতা থেকে ঃ		
	ভীম শঙ্কর	শ্রীশতদ্রুশোভন চক্রবর্তী	৬৯৭
১২।	মজার ম্যাজিক ঃ		
	ফরাসী দেশে দেখানো আজব 'ভোজবাজী'	যাদুকর এ. সি. সরকার	৭০১

আমার সারাদিনের সাথী

লর্ডের জেলি, চকোলেট ও ক্রীম ভরা মনোহর লজেন্স মুখে পড়লে শরীর ও মন মিষ্টি রসে ভরে যায়। মনে হয় রোজই এক বয়াম খাই।

লর্ডের

লজেন্স ও টফি

জেম্‌স্ লর্ড এণ্ড সন্স লিঃ

কলিকাতা-১

সূচী

	বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
১৩।	ছড়াছড়া :		
	(১) দুপুরের ডাক	শ্রীপ্রীতিভূষণ চাকী	৭০৩
	(২) তুল তুল	শ্রীধীরেন করগুপ্ত	৭০৩
১৪।	তোমাদের পাতা		
	(১) দণ্ডকারণ্যের একাংশে	শ্রীফাগুরাম সোরেণ	৭০৪
	(২) শুষ্ক শাখা (কবিতা)	শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়	৭১৩
১৫।	বিজ্ঞান-পত্র		
	অতল জলের আহ্বান	শ্রীপ্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৭১৪
১৬।	দেশ-বিদেশের রূপকথা		
	এক বুড়ো-বুড়ীর গল্প	শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়	৭১৬

ছোটদের উপহার দেবার মতো কয়েকটি বই

হাসির বই

শিবরাম চক্রবর্তীর **হাসির গল্প** ১·৫০
নারায়ণ গাঙ্গুলীর **হাসির গল্প** ২·৫০
স্বপনবুড়োর আরো **হাসির গল্প** ২·৫০
বিভূতি মুখোঃর **হাসির গল্প** ২·৫০
আশাপূর্ণা দেবীর **হাসির গল্প** ২·৫০
প্রেমেন্দ্র মিত্রের **হাসির গল্প** ২·৫০
কুমারেশ ঘোষের **হাসির গল্প** ২·০০

ক্লাসিক

কথা সরিৎসাগরের গল্প ৩·০০
বত্রিশ পুতুলের উপাখ্যান ৩·৫০
ছোটদের আরব্য উপন্যাস ২·৫০
দশকুমার চরিতের গল্প ১·৫০
উদয়ন ও বাসবদত্তার গল্প ২·৫০
পুরাণের সেরা গল্প ২·০০
মহাভারতের গল্প ১·৫০

নানা দেশের রূপকথা ॥ মনোরম গুহ-ঠাকুরতা ২·০০ নীল সাগরের নীচে ২·০০
ওয়ার অ্যাণ্ড্ পীস ॥ অশোক গুহ ২·০০ পিকউইক পেপারস্ ॥ অশোক গুহ ২·০০
গল্পের রাজা ক্রীলভের গল্প ॥ অনিলেন্দু চক্রবর্তী ২·০০ গল্পে কাদম্বরী ১·৫০
রবিনসন ক্রুসো ॥ অশোক গুহ ২·০০ রবীন হুড ॥ দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায় ২·০০
গালিভার্স ট্র্যাভেলস্ ॥ দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায় ২·০০ শিব্রাম THE ভূপর্যটক ২·৫০

এ. কে. সরকার অ্যাণ্ড কোং ॥ ৬।১-এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলি-১২। ফোঃ ৩৪-৪৩১০

সূচী

	বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
১৭।	কেমন করে হলো—ষ্টিম-ইঞ্জিন	শ্রীসুনীল সরকার	৭১৯
১৮।	পিঁপড়ের কথা	শ্রীননীগোপাল চক্রবর্তী	৭২০
১৯।	খুশির ধুম (কবিতা)	শ্রীরমেন দাস	৭২২
২০।	শরীরচর্চার বৈঠক	বিশ্বশ্রী মনতোষ রায়	৭২৩
২১।	খেলাধূলা	শ্রীঅমিতাভ	৭২৬
২২।	নতুন ধাঁধা	শ্রীতরুণ বসু চৌধুরী	৭২৮
২৩।	গত মাসের ধাঁধার উত্তর ও উত্তরদাতাদের নাম		৭২৮
২৪।	সম্পাদিকার চিঠি		৭২৯

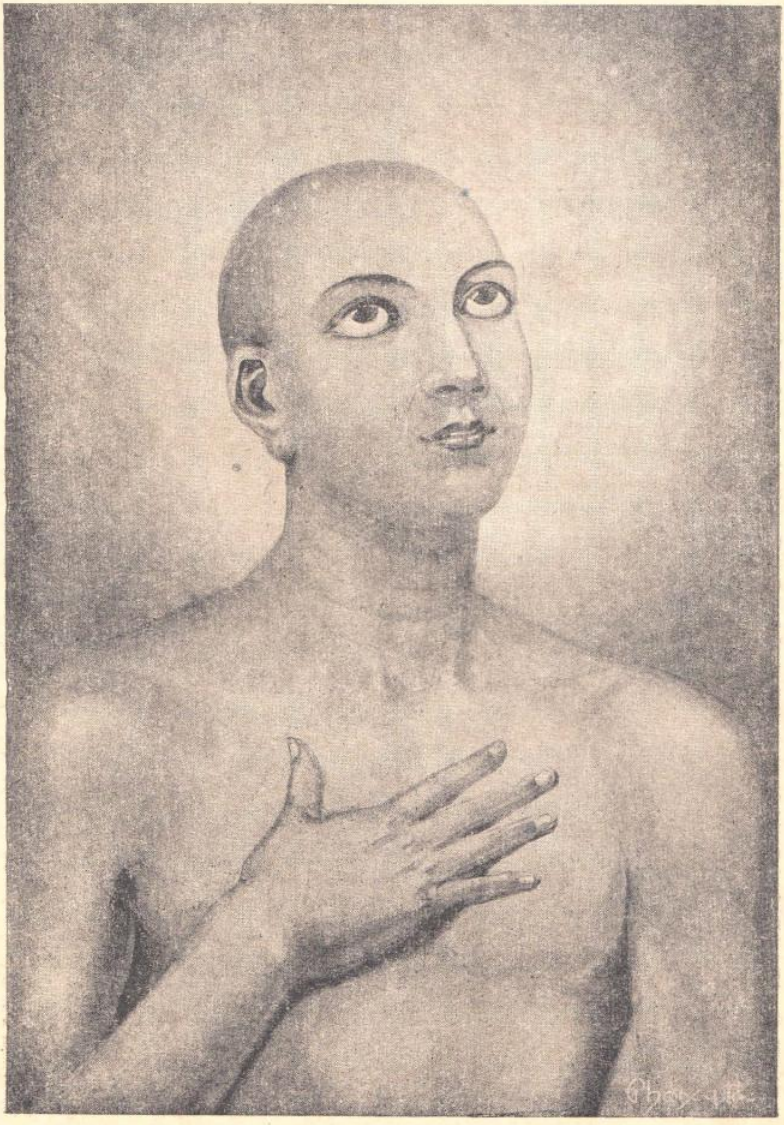

শ্রীচৈতন্য

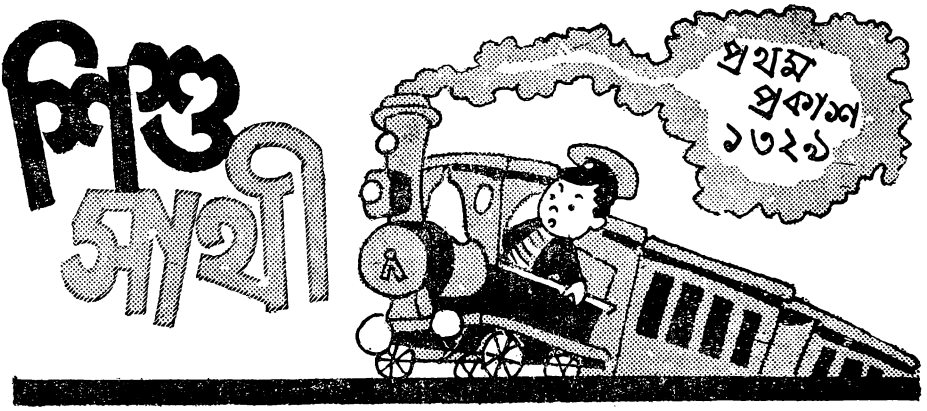

শিশু সাথী

প্রথম প্রকাশ ১৩২৯

৪৭শ বর্ষ ফাল্গুন, ১৩৭৫ ১১শ সংখ্যা

নদের নিমাই

শ্রীবিনয় বাগচী

সুমধুর ফাল্গুনের পূর্ণিমা তিথিতে,
লভেন জনম যিনি এ-বঙ্গ ভূমিতে।
যাঁর আগমনে বঙ্গে প্রেমের নির্ঝর,
বহিল প্লাবিয়া সব হৃদয় কন্দর।
অস্পৃশ্য অনাথে যত বুকে দেন স্থান,
সবাকার মাঝে দানি সমান সম্মান।
আশাহত অভাজন পাইল আশ্বাস,
নবীন প্রেরণা লভি ভুলি হা-হুতাশ।
ধর্ম ও সাহিত্যে এল নতুন চেতনা—
শ্রেষ্ঠ মানবতাবোধ ও সমবেদনা।
কৃষ্ণ নাম প্রচারিতে ব্যাকুল সদাই,
সবার প্রণম্য তিনি নদের নিমাই।

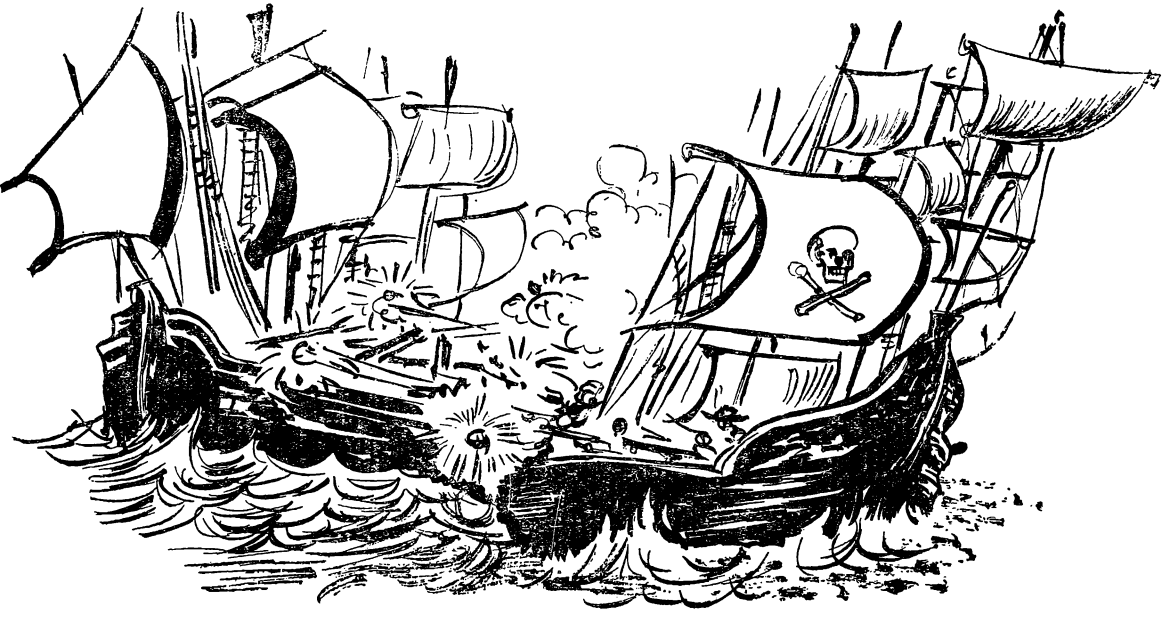

বেনগাজীর আখড়া

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

॥ এগার ॥

জেলেদের মুখ থেকেই সংবাদ পাওয়া গেল।

বোম্বাইয়ের কাছাকাছি সমুদ্রে অনেকগুলি দ্বীপ আছে। তারই কোন কোনটিতে জল-দস্যুদের স্থায়ী আড্ডা আছে। সেখানে তারা কাঠের ঘর বানিয়েছে আর তাতে সরাইখানা আছে। বর্ষাকালের কয়েকটা মাস সেইখানেই তারা আরাম করে। নৌকা করে বোম্বাইয়ে আসে চাল-গম আর তরী-তরকারী কিনতে। গরু, ছাগলের পাল পুষে রেখেছে। লুঠের মাল ও টাকা-কড়িও মজুদ করে সেখানে, কোন কোন দিন জেলেদের ডেকে নৌকো ভর্তি মাছই কিনে নেয়। একেবারে নগদ টাকা, দরদস্তুর নেই। তাদের তখনকার চালচলন দেখে কেউ বলবে না যে তারা ডাকাত।

খোঁড়া কাপ্তেনের খবর দিল সাহানী। বয়স কম, বেপরোয়া। ওদের সঙ্গে সে বছর খানেক কারবার করছে, বললো—বড় মাছ উঠলেই আমার বড় খদ্দের ওই খোঁড়া কাপ্তেন। ওখানকার সরাই-

খানায় পৌঁছে দাও, হাতেহাতে টাকা। আমি যখন প্রথমে যাই, তখন সবাই বলেছিল 'যাস্‌নে, তোর মাছ কেড়ে নেবে', এখন তো দেখি অনেকে যেতে চায় আমার সঙ্গে।

বেণী তাকে ধরে পড়লো—আমাকে নিয়ে যেতে হবে কাপ্তেনের আস্তানায়।

—আমি যেতে গেলেই মাছ নিয়ে যেতে হবে।

—বেশ তো, কাল সকালেই মাছ নিয়ে চল।

—তুমি যাবে কি নিয়ে, তোমাকে তো আর জেলে বলা চলবে না। তোমাকে দেখলেই কাপ্তেন বুঝে নেবে তুমি একজন ভদ্দর লোক। তখন আমি সামাল দোব কি করে?

—বেশ, তাহলে আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবার দরকার নেই। আজ সন্ধ্যার পরে তুমি শুধু আমাকে দ্বীপটা চিনিয়ে দেবে। আমি নিজেই যাবো।

ভালো বকশিষের লোভে সাহানী রাজী হয়ে গেল!

॥ বার ॥

বোম্বাই বন্দরের চার পাঁচ মাইল দূরে একটি পাহাড়ী দ্বীপ। এই দ্বীপে আগে কয়েকঘর জেলের বাস ছিল, এখন জলদস্যুরা তাদের এখান থেকে দূর করে দিয়েছে।

রাত্রির প্রথম প্রহর শেষে এই দ্বীপের কাছে অন্ধকারে একখানি জাহাজ এসে নোঙর করলো। জাহাজের ডেকের উপর আবদুল্লা, বেণী ও সাহানী দাঁড়িয়েছিল। দ্বীপের উপর কয়েকটা আলো দেখিয়ে সাহানী বললো—ওইগুলোই ওদের সরাইখানা, ওরই চারিপাশে কয়েকখানা ঘরে ওরা থাকে।

জাহাজের পিছনে সাহানীর নৌকা বাঁধা ছিল, বখশিষের টাকা নিয়ে সাহানী বিদায় নিল।

বেণী আর অপেক্ষা করতে পারলো না, বোম্বাই থেকে সে দু'জন নতুন গোলন্দাজ সিপাই জোগাড় করে এনেছিল, বললো—তৈরী হও, বোম্বেটেদের ওই আস্তানার উপর কামান দাগতে হবে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই কামানের মুখ ফিরিয়ে গোলন্দাজর তৈরী হলো। তারপরেই জাহাজ টলে উঠলো। গুম-গুম করে গোলা ছুটলো দ্বীপের দিকে।

পর পর আটটা গোলা।

বোম্বেটেরা কোনদিন ধারণা করতে পারে নি যে, কোনদিন সেই দ্বীপে তারা এভাবে আক্রান্ত হবে। তাদের সঙ্গে এমনভাবে দুষমণি করার সাহস কার? তা সে যাই হোক্, উপস্থিত আত্মরক্ষা করার জন্য তারা তৎপর হলো কিন্তু অন্ধকারে কারা গোলা ছুঁড়ছে তা কেউ আন্দাজ করতে পারলো না।

মিনিট পনেরো পরে আবার গোটা চারেক গোলা, পনেরো মিনিট পরে আবার।

জাহাজ, সমুদ্র, দ্বীপ,—সবই অন্ধকার, শুধু অগ্নিময় গোলক ছুটে যাচ্ছে আর গিয়ে সেখানে ফাটছে, আগুনের ঝিলিক আর বিস্ফোরণের শব্দ ছাড়া আর কিছু নেই।

এবার দেখা গেল চালাঘর জ্বলছে।

দূরে গাছপালার আড়াল থাকলেও বোঝা যায় কয়েকখানা ঘর পুড়ছে, আগুনটা বেশ জোরালো, তার বেশী আর কিছু ঠাহর করা যায় না।

বেণী সব দেখেশুনে বলে—ঠিক আছে, এবার ওই আগুনটার আশেপাশের উপর নীচে কামান দাগো। ওই শয়তানদের সব কিছু খতম্ করে দাও।

দশ পনেরো মিনিট অন্তর দু'টি কামানের দু'টি করে গোলা পড়তে থাকে দ্বীপের উপরে।

॥ তেরো ॥

সারা রাত গোলাবর্ষণ চললো।

উষার আলো যখন ফুটলো তখন দেখা গেল, দ্বীপের কোনখানে আর জনমানবের সাড়া নেই। তবে কি ভুল হলো? রাতের অন্ধকারে সাহানী কি দ্বীপ ভুল করলো? কিন্তু রাতে তাহলে আগুনে পুড়লো কি? সেগুলো তো ঘর বলেই মনে হলো—তবে?

বেণী বললো—আমি নেমে দেখতে চাই।

আবদুল্লা বললো—সেটা কি বুদ্ধির কাজ হবে? ওরা যদি কোথাও লুকিয়ে থাকে ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়বে।

—আমি দল নিয়ে যাবো।

জাহাজের খোলের মধ্যে আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র ছিল। দশজন খালাসী দশখানি তলোয়ার নিয়ে বেণীর সঙ্গে নৌকায় উঠলো।

নৌকা এসে ভিড়লো দ্বীপের ঘাটে। দু'পাশে পাহাড়ী জঙ্গল, মাঝখান দিয়ে পায়ে-চলা পথ গিয়ে পাহাড়ের উপরে উঠে গেছে। সেই পথ ধরে তারা উপরে উঠতে শুরু করলো।

ছোট্ট দ্বীপের ছোট পাহাড়। উপরে উঠতে বেশীক্ষণ লাগলো না। এবার পথের পাশে কয়েকখানি চালা ঘর নজরে পড়লো, প্রায় ভস্মীভূত, তখনো ধোঁয়া উঠছে। এদিকে ওদিকে কয়েকটা লোককেও পড়ে থাকতে দেখা গেল।

বেণী একে একে পড়ে থাকা ইতস্ততঃ মানুষগুলোকে দেখতে লাগলো। একদিকে দু'টো লোককে চিনলো,—সর্দার খালাসী আর তার সঙ্গী। দু'জনেই রক্তাক্ত, মৃত। বেণী বললো—না, ভুল হয় নি সাহানী ঠিকই চিনিয়ে দিয়েছে।

আরো ক'পা গিয়ে একটা কাতরোক্তি শোনা গেল। একখানি কাঠের বাড়ী আধপোড়া হ'য়ে ভেঙে পড়েছে, তারই নীচে পড়ে কে যেন কাতরাচ্ছে! বেণী থমকে দাঁড়ালো। বললো—দেখ তো?

খালাসীরা হাত চালালো। বের করলো এক রমণীকে। মাথায় চোট লেগে, মুখের উপর রক্ত গড়িয়ে এসেছে। তবু সেই মুখের পানে তাকিয়ে বেণী চমকে উঠলো—মা!

রমণীও চমকে উঠলো, চোখ মেলে তাকিয়ে থর থর করে কেঁপে উঠলো, তারপরেই জ্ঞান হারালো। আর কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

॥ চৌদ্দ ॥

কোন এক সময় মায়ের চেতনা হ'লো। বেণীর মুখের পানে চুপ করে তাকিয়ে রইলেন অনেকক্ষণ। তারপর সস্নেহে ধীরে ধীরে বেণীর গায়ে-মাথায় হাত বুলাতে লাগলেন। ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন—তুই বেঁচে আছিস্? তোকে যে আবার দেখতে পাব, এ আমি ভাবি নি। গোবিন্দজীকে কত জানিয়েছি, তিনি আমার কথা শুনেছেন!

ওপাশে তখন ভগ্নগৃহের কাঠের নীচে থেকে খালাসীরা তিনটি মৃতদেহ বের করেছে। মা সেদিক পানে মুখ ফেরালেন, পরক্ষণেই হুহু করে কেঁদে উঠলেন, বললেন—সব শেষ হয়ে গেছেরে, সব শেষ...

বেণীর মন দুলে উঠলো, তাড়াতাড়ি উঠে গেল মৃতদেহ তিনটি দেখতে। একজনের মাথাটা

খেঁৎলে গেছে, তবু মুখখানা তার চেনা যায়। সে মুখ তার ছোট বোনের—গৌরীর। বেণীর দু'চোখ ধোঁয়া হয়ে গেল। টলতে টলতে সে সেখানে বসে পড়লো।

মা এবার উঠে বসলেন। তারপর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন; এক পা দু'পা এগিয়ে এসেই অন্ধকারে হাতড়ে বেড়ানোর মত হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন বেণীর উপর।

॥ পনের ॥

মা ও বোনের অগ্নিসৎকার করে বেণী জাহাজে ফিরলো।

জাহাজ মোম্বাই পৌঁছালো সন্ধ্যাবেলা।

সারাক্ষণ বেণী থম্‌থমে মুখে ডেকের উপর বসেছিল। আবদুল্লাও পাশে ছিল। দু-একটা সান্ত্বনার কথা আবদুল্লা বলেছে, বেণী কোন সাড়া দেয় নি। এখন বেণীর গায়ে হাত বুলিয়ে আবদুল্লা বললো—সকাল থেকে কিছু খাস নি, এখন হাতমুখ ধুয়ে কিছু খা—

—নাঃ, আমি চলে যাবো—

—কোথায় যাবি?

—যেখানে হয়!

—ফকিরি নিয়ে চলে যাবি, আর আমি যে তোকে নিজের ছেলে বলে মনে করি, আমায় দেখবে কে? বুড়ো বাপকে ছেলে দেখবে না?

বেণী আবদুল্লার মুখের পানে তাকালো।

আবদুল্লা বললো—তুই হিন্দু কিনা, তোদের ওই এক রোগ। অন্যায় হলো, অত্যাচার হলো, অমনি সব ছেড়ে ফকিরি নিয়ে চলে গেল। কেন? অত্যাচারের প্রতিকার করো, তুমি যে অনাচার সইলে, সেই অনাচার যেন আর কারও ওপর না হয়—তাই করো। জোয়ান বয়সে এতো মুষড়ে পড়লে চলবে কেন? নিজের কথাই শুধু ভাববে, দেশে তো আরো মানুষ রয়েছে। তাদের কথা ভাববে না?

—আপনি কি করতে বলেন?

—আমি বলি দল তৈরী কর, ঠ্যাঙ্গাড়ে ফৌজের দল। সেই ফৌজ নিয়ে চড়াও হও এই সব দ্বীপে। এই অঞ্চলের যেখানে যত ডাকাত আছে নিশ্চিহ্ন করে দাও। জল-দস্যুর নাম মুছে দাও এদেশ থেকে। ওদের জাহাজ ধরে এনে জমা কর সুলতানী নৌবহরে, জোয়ান বয়স, ফকিরি করবে কি! কাজের মতো কাজ কর।

আবদুল্লা বেণীকে গরম করে দেবার চেষ্টা করলো। তোমার টাকা-পয়সার দরকার হয়, আমি

দোব। ভাল কাজে টাকার অভাব হবে না। খোদা তোমায় কাজ করতে পাঠিয়েছেন, কাজ কর। কাঁধে ঝুলি নিয়ে পথে পথে ভিখ্ মাঙ্গা আর হরিনাম করা আমার দু'চক্ষের বিষ!

—লোকে আমার দলে আসবে? আমার কথা শুনবে?

—আলবৎ শুনবে, তোমার মত যাদের ঘা লেগেছে, তারা শুনবে, না হয় টাকা দিয়ে শোনাবো। তবু যদি মানুষ না পাওয়া যায় তখন ফকিরি নেবে, এখন কি! চেষ্টা না করে হাল ছাড়বে কেন?

এবার বেণী যেন একটু সহজ হয়েছে বলে মনে হলো। আবদুল্লা বুঝলো তার কথায় কাজ হয়েছে। বললো—তবে তোকে কাজ শুরু করতে হবে ওই সোমনাথ থেকে, যেখানে তোকে সবাই জানে চেনে। এসব কাজ দু-চার দিনের কাজ নয়—লেগে থাকতে হবে, দিনের পর দিন, বছরের পর বছর। সেই কাজের পথে চল। তা নয়—মা গেল, বোন গেল, ছেলে পথে ভিক্ষে করতে বেরুলো; তাতে ডাকাতদের কি হলো? তুই সারাজীবন হরিকে ডাকলে হরি এসে কি ওই ডাকাতদের ঠাণ্ডা করবে? আজ অবধি কোথাও তা শুনেছিস্? তবে? এখন মুখে হাতে জল দে, কিছু খা। সয়তানের সঙ্গে যুঝতে হবে, তবিয়ৎ ঠিক রাখ্! নে, ওঠ্! বন্দরে নেমে কিছু মিঠাই খেয়ে আসি।

আবদুল্লা বেণীর হাত ধরে উঠে পড়লো। [ক্রমশঃ]

ফাল্গুন এলো

—ক্ষিতীশচন্দ্র ভৌমিক

বিপুল প্রাণের স্পন্দন নব, নব হিল্লোলে শুনি,
প্রাণ-তরঙ্গে এলো ফাল্গুন মায়ার স্বপ্ন বুনি।
শ্যাম পল্লবে, স্বর্ণালী তৃণে,
কেকার কুহরে, কোকিলের বীণে,
কলতান শুনে, নব ফাল্গুনে পরাণের সুরধুনী
মর্মর রবে লীলায়িত হ'বে—তারই কল্লোল শুনি!

সুপ্তিসঘন নিসর্গপুরী যৌবন-প্রাণ স্পর্শে
অতনু-লীলায় অমোঘ-মন্ত্রে জাগিবে দীপ্তহর্ষে!
সোণার কাঠিটি নিয়ে আজ হাতে
এলো ফাল্গুন নবীন প্রভাতে—
নিবিড়নিদ্র রাজকন্যায় জাগাতে ক্ষীণায়ু বর্ষে,
যৌবনমদে চঞ্চলপদে ফাল্গুন এলো হর্ষে।

[একটি পাতা-ঝরা শুক্‌নো ফুল বাগান। সেই উদ্যানের শ্রী একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। গাছের তলায় ঝরা পাতার রাশ। বাগানে একটিও ফুল নেই। দূর থেকে কথকের বাণী ভেসে এলো।]

কথক॥ শীতের দিনের পাতা-ঝরা শুক্‌নো ডালে নতুন করে আবার কিসের শিহরণ জাগে? দূরের বনে কি কোকিল ডাকছে?

[কোকিলের ডাক শোনা গেল]

কাননে-কান্তারে দখিন হাওয়ার আল্‌তো-ছোঁয়া লাগছে। কে যেন ডাকছে, ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এসো। কে যেন দূরের গাঁয়ের পথে আপন মনে গান গেয়ে চলেছে—

[উদাস-পথিকের গান]

কে যেন দূর-কাননে ডাক দিয়ে যায়,
দখিনা ডাকছে কিগো আল্‌তো ছোঁয়ায়?
আকাশে কাহার হাসি—
কে যেন বাজায় বাঁশী
অজানা কোন পুলকে মন্‌কে মাতায়।

কথক॥ আরে-আরে-আরে! গান শুনে কাঁথাবুড়ীর ঘুম ভেঙে গেল বুঝি? ওই যে কাঁথাবুড়ী বক্‌ বক্‌ করতে করতে এই দিক পানেই আসছে—

কাঁথাবুড়ী॥ কি জ্বালাতনের কথা হল বলত'! শীতের দিনে দিব্যি কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়েছিলাম। কে আবার এসে এখানে গান ধরল? বলে কিনা,—অজানা কোন পুলকে মনকে মাতায়! আর মন মাতিয়ে কাজ নেই বাপু! আমি একটু নিরিবিলি ঘুমুতে চাই।

[কোকিলের ডাক শোনা গেল, কুহু-কুহু]

কাঁথাবুড়ী॥ কে রে, এখানে কুহু-কুহু করে ডাকে? আমার ঘুমের দফা তা হলে গয়া! কে তুই জ্বালাতন করতে এলি শুনি?

[কোকিলের প্রবেশ]

কোকিল॥ বা—রে! আমায় চেনো না—কাঁথাবুড়ী মাসি? আমি যে বসন্তের কোকিল—

[কোকিলের গান]

গান গেয়ে যে ঘুমকে ভাঙাই আমি কোকিল—
বসন্ত ত' আস্‌বে, ঘরের খোলো না খিল।
ডাকবো সবায় নতুন সুরে—
ডাক্‌বো কাছে ডাক্‌বো দূরে—
এই ভুবনে সবার সনে মনেরই মিল—
আমি কোকিল॥

কাঁথাবুড়ী॥ আমি কাঁথাবুড়ী। ঘুমুতে পারলে আর কিছুটি চাইনে। পোড়ারমুখো কালো কোকিল এখান থেকে সরে পড়ো ত! অ্যাঁ! আবার কে আসে?

মলয় অনিল॥ আমি মলয় অনিল গো। বনে-বনে আমি আমার পরশ বুলিয়ে দিয়ে যাবো, তবেই ত' বসন্তরাণী আসবে—

কাঁথাবুড়ী॥ আহা! নাম শুনে মরে যাই। মলয় অনিল! তোমায় এসে কে আবার সুড়সুড়ি দিতে বলেছে বাপু? শীত ছিল, ছিল আমার কাঁথার আদর···। দিব্যি এক কোণে গুটি-সুটি মেরে নাক ডাকিয়ে ঘুমুতাম।

[মলয়-অনিলের গান]

মলয়-অনিল এলাম তোমার ঘুম ভাঙাতে—
ফুর্‌ফুরে বায়—এলাম তোমার মন রাঙাতে!
উঠল জেগে বনের পাতা
বলে, ওরে বনকে মাতা—
ডাক দেবো আজ কুসুম দলে সব জাগাতে।

কাঁথাবুড়ী॥ কি ঝঞ্ঝাটের কথা গো! মলয়-অনিল এসে সুড়সুড়ি দিচ্ছে,—তাতে রক্ষা নেই। আবার বলছে কিনা—ডাক দেবো আজ কুসুম দলে সব জাগাতে! ওই যে কথায় বলে না,—আপনি খেতে ঠাঁই পায় না, শঙ্করাকে ডাকে। না বাপু, এত সব ঝুট্-ঝামেলা আমার সহ্যি হবে না। তোমরা সবাই সরে পড়ো। আমি মনের আনন্দে কাঁথা মুড়ি দিয়ে একটু ঘুমুবো—

[কুসুমের প্রবেশ]

কুসুম॥ ঘুমুবে কি গো কাঁথাবুড়ী? আমি কুসুম এলাম তোমার শুক্‌নো মালঞ্চে ফুল ফোটাতে।

কাঁথাবুড়ী॥ বটে! বটে! বটে! তুমি এলে আমার শুক্‌নো মালঞ্চে ফুল ফোটাতে। অত সোহাগে আর কাজ নেই বাপু। এরা সব কেমন লোক গা? আমায় এতটুকু ঘুমুতে দেবে না?

কুসুম॥ আচ্ছা কাঁথাবুড়ী, সারাটা শীতকাল ত' কাঁথা মুড়ি দিয়ে দিব্যি ঘুমুলে। এখনো তোমার ঘুমের আশ মেটেনি? দেখ না, কি ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছে বাইরে। এইবার তোমার ছেঁড়া-কাঁথা গুটোবার সময় হল।

কাঁথাবুড়ী॥ এ কি অলক্ষুণে কথা গো! বলে কিনা আমার কাঁথা গুটোবার সময় হল। কাঁথা না থাকলে কাঁথাবুড়ী কি বাঁচবে? যেখানে কালো-কালো ছায়া, যেখানে আঁধারে মাকড়শা জাল বুনেছে,—যেখানে সুয্যির আলো ঢুকতে পারে না,—সেই ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা শীতল ঠাঁইয়ে আমি কাঁথা মুড়ি দিয়ে আরামে ঘুমুই—

কোকিল॥ কুহু—কুহু—কুহু! এবার আর ঘুম নয়। এবার জাগরণ। আমি কোকিল, বসন্তরাণীর আগমনের খবর জানাবার জন্যে আগ বাড়িয়েই ত' এসেছি। আমার গান যদি তুমি শুনতে চাও ত', কাঁথা গুটোও।

কাঁথাবুড়ী॥ কে রে কালো কুচ্ছিত পাখীটা? আমায় কিনা কাঁথা গুটোতে বলে? এই বাগানের ভেতর ঢুকেছ কি ঠ্যাং একেবারে খোঁড়া করে দেবো। তোর পাখনা দেবো কেটে। আর গলায় ঢেলে দেবো হিম-শীতল জল! দেখি কেমন করে গান বেরোয়!

কোকিল॥ আমি একা নই কাঁথাবুড়ী। ওই দেখ—আমার পেছন পেছন বনের পাখীর দলও এসেছে। চন্দনা, বুলবুলি, টিয়া, ময়না, কাকাতুয়া! ওরাও বসন্তের গান গাইবে এখানে—

[অনেক রকম পাখীর ডাক শোনা গেল]

কাঁথাবুড়ী॥ হায়-হায়-হায়! এরা যে সবাই দল বেঁধে গোলমাল শুরু করল। কি করে ঘুমুবো আমি?

পাখীরা॥ আমরা পাখীর দল, গানে গানে এই বনভূমিকে জাগিয়ে তুলবো—

[পাখীদের গান]

আমরা পাখী, পাখ্ মেলেছি নীল আকাশে—
বসন্তেরই আসার কথা গাই আভাসে!
পাখীর ডানায় জাগছে পুলক
উঠল জেগে দ্যুলোক-ভূলোক
রবির কিরণ সাথে মোদের আজ জাগা যে!

কাঁথাবুড়ী॥ হায়—হায়—হায়—এই বিপদ থেকে আমাকে কে বাঁচাবে? সবাই যদি এমন করে হল্লা করে তবে আমি কোথায় কাঁথা পাতি?

[বাগানের মালির প্রবেশ]

মালি॥ হা—হা—হা! ও কাঁথাবুড়ী, এইবার তোমার কাঁথায় আমি আগুন ধরিয়ে দেবো—

কাঁথাবুড়ী॥ তুমি আবার কে? ঝামেলা বাড়াতে এইখানে আবার এসে জুটলে?

মালি॥ হা—হা—হা। আমি হচ্ছি এই বাগানের মালি। আমায় চেনো না বুড়ী? শীত পালিয়েছে, এখন আমার অনেক কাজ। সবার আগে বাগানের ঝরাপাতা সব ঝেটিয়ে বিদায় করবো। তারপর মাটি কুপিয়ে নরম করবো। তাতে সার দেবো মিশিয়ে। জল দেবো ছিটিয়ে। নানা জাতের ফুল গাছ দেবো পুঁতে। তবে না নানারঙের ফুলে-ফুলে ভরে উঠবে এই বাগান। পাখীর দল গান গাইবে, গুণ্-গুণ্ করে মৌমাছি উড়ে বেড়াবে। রবির কিরণ এসে আলো ছড়াবে—

মলয় অনিল॥ আর আমি মলয়-অনিল, আল্তো করে হাওয়া করবো সারা বাগানটায়—

[ছেলের দলের প্রবেশ]

ছেলেরা॥ আর সেই সঙ্গে আমাদেরও ডাক দিও। আমরা ছেলের দল। তোমাদের সবার সঙ্গে বাগানে নাচ্বো, গাইবো···তবে ত' বাগানে ফুল ফুটবে।

[ছেলের দলের গান]

বাঁধন-হারা আনন্দে
বসন্তে প্রাণ বন্দে!
সূর্য দিল আলো—
আর মলয় দিল প্রীতি—
মেদিনী দেয় ভালোবাসা—
পাখী শোনায় গীতি—
নাচবো মোরা কানন ঘিরে নতুনতরো ছন্দে॥

[কানন-কুসুম দলের নাচতে নাচতে প্রবেশ]

কানন-কুসুম ॥ আমরা কানন-কুসুম, ফোটবার লগন এলো—

[কানন-কুসুম দলের গান]

এবার মোদের ফোটার পালা
জাগ রে সবাই জাগ্—
বসন্তের এই আগমনে
সবাই বাজা শাঁখ!
হিমেল হাওয়া পালায় দূরে
কানন জাগে নতুন সুরে—
কুসুম-বনের ফুলের সুবাস
ছড়িয়ে আজি যাক্ ॥

য—ব—নি—কা

একটি অবিস্মরণীয় মৃত্যু

শৈলেন দত্ত

১৬০০ খৃষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারী।

আদালতের রায় বেরুল : আসামীর মৃত্যুদণ্ড!

দণ্ডাদেশে উচ্চারিত হ'ল : আসামীকে এমনভাবে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে যে, তার দেহ থেকে মৃত্যুবরণ করার সময় একফোঁটা রক্ত ঝরবে না।

তখনকার দিনের নিষ্ঠুরতম মৃত্যুদণ্ড ছিল এই রকম। আগুনের লকলকে শিখার মধ্যে দাঁড়িয়ে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় আসামীকে তিলে তিলে পুড়ে মরতে হবে!

১৭ই ফেব্রুয়ারী সেই মৃত্যুর দিন।

আসামীকে রাজপথ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। হাতে-পায়ে ভারি ভারি লোহার শেকল বাঁধা। শেকলগুলো ঠং ঠং শব্দ তুলছে যতই সে চলছে।

কাতারে কাতারে লোক সামনে পেছনে। যেন মস্ত এক শোভাযাত্রা চলেছে! গীর্জার ঘণ্টা

বাজছে ঘন ঘন। শত শত পুরোহিত স্তোত্র পাঠ করছেন। সামনে এক বিরাট পতাকা উড়ছে—টক্‌টকে রক্তলাল।

ধর্মযাজকেরা চলেছেন। পুরোহিতরা চলেছেন। চলেছে ছোট-বড় ধনী-নির্ধন সকলে। বাড়ীর ছাদে, প্রাসাদের চূড়ায়, ঘরের জানালায় উৎসুক দর্শকের ভিড়।

মাঠের মধ্যে একটা বিরাট দণ্ড। বহুলোক ইতিমধ্যে সেখানে জড়ো হয়েছে।

মাঠে আর লোক ধরে না। হৈ-হৈ চিৎকার—আনন্দোল্লাস—আকাশ-বাতাস ভারি হয়ে উঠছে।

শেষবারের মত সুযোগ দেওয়া হ'ল আসামীকে। ধর্মযাজক চিৎকার করে উঠলেন: বল, যা বলেছ ভুল। তোমার জীবন ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

আসামী এই ভিক্ষার দান হাসিমুখে ফিরিয়ে দিল। উন্নত মস্তকে, বলিষ্ঠ পায়ে সে এগিয়ে গেল দণ্ডটির দিকে।

দণ্ডটির সাথে শক্ত করে আষ্ঠে পৃষ্ঠে বাঁধা হ'ল তাকে। তারপর আগুন জ্বেলে দেওয়া হ'ল।

রোমের আকাশ লাল হ'য়ে গেল আগুনের শিখায়। আসামীকে আর দেখা গেল না।

পুড়ে পুড়ে ছাই হ'য়ে গেল সে। কিন্তু আত্ম-সমর্পণের একটা করুণ আবেদনও তার মুখ থেকে বেরুল না।

এত করেও কিন্তু ধর্মযাজকেরা বিজ্ঞানের জয়যাত্রার পথ রোধ করতে পারেন নি।

আসামীটি কে? কি তার অপরাধ?—জানার জন্যে মনটা তোমাদের উশ্‌খুশ্‌ করছে নিশ্চয়ই।

আসামীটি হলেন জিওরদানো ব্রুনো। একটু স্বাধীনভাবে চিন্তা করতেন—আর পাঁচজনের মত পুরোহিত-ধর্মযাজকদের কথা মাথা পেতে মেনে নিতেন না—এই তাঁর অপরাধ।

এতেই এত কঠিন মৃত্যুদণ্ড!

তাহলে গোড়া থেকে বলি।

ইতালীর ছোট্ট শহর নোলা। ১৫৪৮ খৃষ্টাব্দে সেই ছোট্ট শহরে ব্রুনোর জন্ম হয়। খুব ছোট্টবেলায় বাপ-মা'কে হারিয়ে ছোট্ট একটা আশ্রমে মানুষ হতে থাকেন ব্রুনো। পুরোহিতদের অনুমতি নিয়ে লেখাপড়া করতে থাকেন।

তখনকার দিনে পাটিগণিত বা এ-বি-সি-ডি পড়ানো হ'ত না। শুধু ধর্মের বই পড়নো হ'ত। ব্রুনো তাই পড়তে শুরু করেন।

নানাসম্প্রদায়ে বিভক্ত ক্যাথলিক সন্ন্যাসীদের মধ্যে তখন ডোমিনিকানদের প্রভাব ছিল খুব বেশি। প্রতাপও ছিল তেমনি।

এই ডোমিনিকানদের হাতেই ব্রুনোর হাতে-খড়ি। শীঘ্রই তাঁর জ্ঞানবুদ্ধি দেখে ডোমিনিকানরা তাঁকে পুরোহিত করে দিল।

কিন্তু ছোটবেলা থেকেই একটু স্বাধীনভাবে চিন্তা করতেন ব্রুনো। গীর্জার অনেক শিক্ষা-নিয়মকানন তাঁর কাছে কেমন ধোঁয়াটে মনে হ'ত। একটু বিচার বিশ্লেষণ করে তিনি সব কিছু দেখার পক্ষপাতী ছিলেন।

হঠাৎ সুযোগ জুটে গেল!

গীর্জার যে পাঠাগারে তিনি পড়াশুনা করতেন তারই এককোণের একটা শেল্‌ফে তিনি একটা বই আবিষ্কার করলেন। পুরাণো বই। চামড়ায় বাঁধানো। পাতাগুলো হল্‌দে হ'য়ে গেছে।

কার বই জানো?

কোপারনিকাসের বই। যিনি প্রথম বললেন পৃথিবী তার আপন কক্ষপথে ঘোরে।

বইটা হাতে পেয়ে ব্রুনো আত্মহারা হ'য়ে গেলেন। যেন এক গুপ্তধনের সন্ধান পেয়ে গেছেন। খাওয়া নেই, ঘুম নেই, তিনি কখনো পাঠাগারের এককোণে বসে, কখনো বা নিজের ঘরের দরজায় তালাবন্ধ করে চুপিচুপি আগাগোড়া বইটা পড়ে ফেললেন। থাকতে না পেরে কথাটাও বলে ফেললেন গীর্জার এক সন্ন্যাসীকে!

আর যায় কোথায়! প্রচার হ'তে হ'তে কথাটা গিয়ে পড়লো ডোমিনিকানদের কর্তৃপক্ষের কাছে। কঠোর শাস্তির ভয় দেখানো হ'ল তাঁকে।

যুবক ব্রুনো দেশ ছেড়ে পালিয়ে এলেন।

তখনকার দিনে ইতালী থেকে সুইজারল্যাণ্ড খুবই দুর্গম ছিল। প্রতিবেশী রাষ্ট্র দু'টির মধ্যে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আল্‌পস্ পর্বতমালা। এখানে ওখানে গিরি-গহ্বর, হিংস্র জন্তু আর দস্যু-ডাকাত ভরা বিপদ-সংকুল আঁকাবাঁকা সরু সরু গিরিপথ।

ধনীরা তবু যেতে পারতো গাধার পিঠে চড়ে, স্থানীয় লোকজনদের সাথী করে। কিন্তু গরীবদের সে উপায় ছিল না। তাদের যেতে হ'ত গিরিপথ ধরে পায়ে হেঁটে। পায়ে পায়ে মৃত্যুর সংগে লড়াই করে। তুষারঝড়, দস্যু আর চড়াই তাদের কাছে বিভীষিকা হ'য়ে দাঁড়াতো।

১৫৭৬ খৃষ্টাব্দ। শীতকাল। সারা রাজ্য ঝড় আর তুষারপাতের তাণ্ডব নৃত্য চলেছে।

একদল যাত্রী চলেছে সুইজারল্যাণ্ড অভিমুখে। ব্রুনো ওদের সংগ নিলেন।

পরণে সন্ন্যাসীর পোষাক। মুখমণ্ডল একটা টুপি দিয়ে ঢাকা।

পথের চটিতে খেতে বসে তিনি কারুর সংগে কথা বললেন না। এককোণে অন্ধকারে বসে চুপচাপ যা পেলেন খেলেন।

ধর্মযাজকদের কঠোর শাস্তির ভয়ে পালিয়ে এসেছেন তিনি।

চারিদিকে ইতিমধ্যে পুলিশের অনুচর পাঠানো হয়েছে। সুইজারল্যাণ্ডেও ধর্মযাজকদের কড়া নজর ঘুরছে চারিদিকে।

আত্মগোপন করে রইলেন ব্রুনো।

মনের মধ্যে অথচ তোলপাড় করছে কোপারনিকাশ। আপন বিচার-বুদ্ধি দিয়ে যা বুঝেছেন তাকে আর কিছুতে মন থেকে তাড়াতে পারছেন না। বরং নিজের চিন্তাও কোপারনিকাশের চিন্তার সংগে যুক্ত হচ্ছে। বিশ্বপ্রকৃতির নিয়মের আরও পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা তিনি দিলেন।

ব্রুনো বললেনঃ শুধু কি পৃথিবী, সূর্যও আপন অক্ষের ওপর ঘোরে। আরও বললেনঃ আমাদের এই পৃথিবীর মত আরও অনেক গ্রহ আছে। এরাও সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে। পশ্চিম থেকে পুবমুখো।

ব্রুনোর ধারণা যে কত স্পষ্ট, পরবর্তীকালে তার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

য়ুরেনস্ এমনি একটা নতুন গ্রহ—পৃথিবীর ৩৬৫ দিনের মত সূর্যকে একবার ঘুরে আসতে যার ৮৪ বছর লাগে—শনিগ্রহের পরের বৃত্তাকার রাস্তায় যার চলাফেরা—সেই য়ুরেনস্ গ্রহটি বৈজ্ঞানিকদের চোখে ধরা পড়ে ব্রুনোর মৃত্যুর প্রায় তিনশ' বছর পরে।

ব্রুনো এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে আর একটা দামী কথা বলেনঃ সূর্য একটা নক্ষত্র। এই রকম

কোটি কোটি নক্ষত্র আছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে—সূর্যের মত আমরা তাদের দেখতে পাই না; তার কারণ তারা পৃথিবী থেকে অনেক অনেক যোজন দূরে। মাপতে গেলে সংখ্যায় কুলোয় না। সূর্যের মত অসংখ্য গ্রহ, উপগ্রহ নিয়ে এদের জগৎ। ব্রুনোর এ-সব ধারণা বিজ্ঞানীদের উন্নত যন্ত্রপাতির কষ্টিপাথরে যাচাই হ'য়ে গেছে।

আরও মারত্মক কথা: পৃথিবীর মত প্রতিটি নক্ষত্র-জগৎ অনবরত বদলাচ্ছে। এই কথা শুনেই ধর্মযাজকের দল তার ওপর খাপ্পা হ'য়ে উঠলেন।

তাঁরা বললেন: লোকটা খোদার ওপর খোদকারি করতে চাচ্ছে! এ-সব ভগবানের অবমাননা। লোকটা ধর্মের শত্রু।

একদেশে ব্রুনোর ঠাঁই হয় না বেশিদিন। সব দেশেই তখন খ্রীষ্টধর্মের প্রভাব—খ্রীষ্টধর্মের প্রতাপ। গীর্জার কর্তৃপক্ষের কানে উঠলেই তাঁরা ব্রুনোকে দেশ থেকে দূর করে দেন।

এ যেন এক পরিব্রাজকের জীবন। ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে নিয়ে একদেশ থেকে অন্যদেশে ঘুরে বেড়ান। আর যেখানেই যান, যতটুকু সময় পান, বলেন বিশ্বসৃষ্টির রহস্য সম্বন্ধে নিজের চিন্তার কথা।

ও রকম একটা ছন্নছাড়া ভিক্ষুককে দেখে লোকজন ভিড় করে দাঁড়ায়। তাঁর কথা শোনে। মুখে মুখে কথাগুলো ছড়িয়েও পড়ে দূর থেকে দূরান্তরে। দেশ-দেশান্তরের মানুষের ভাবনাগুলো নাড়া খায়। তারাও ভাবে।

ধর্মযাজকদের ক্রোধের আগুনে যেন ঘি পড়লো।

লোকটাকে না মারলে রেহাই নেই। ধর্মের সর্বনাশ হয়ে যাবে!

চর পাঠানো হ'ল। ইতালীর এক ধনী যুবক—জিওভান্নি মোসেনিগো যার নাম, তিনিই এলেন চর সেজে।

দেশে ফিরে চলো। আমি তোমায় দেখবো। সমস্ত ভার নেবো।

ইতালী! তাঁর প্রিয় স্বদেশভূমি! কতদিন কত বছর হ'ল তিনি ছেড়ে এসেছেন!

ব্রুনোর প্রাণটা কেঁদে উঠলো। ছোট্টবেলায় মা-বাবাকে হারিয়ে এই জন্মভূমিকেই তিনি বড় আপন বলে জানতেন। আবার তার কোলে ফিরে যাবেন!

ফাঁদে পা দিলেন স্বদেশ-পাগল ব্রুনো।

মোসেনিগোর দুরভিসন্ধি কিছুদিনের মধ্যেই তিনি ধরে ফেললেন। কিন্তু তখন বড় দেরি হয়ে গেছে।

১৫৯২ খৃষ্টাব্দের ২৩শে মে, ব্রুনো গ্রেফতার হলেন।

ধর্মযাজকেরা তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করলেন।

এক বছর নয়, দু' বছর নয়, দীর্ঘ আট বছর জেলে কাটালেন ব্রুনো। কি দুঃসহ যন্ত্রণা! সীসের

ছাদ। গরমকালে তেতে আগুন হ'য়ে থাকতো। সীসে গলে গলে পড়তো। আর শীতকালে বরফের মত ঠাণ্ডা। ধীরে ধীরে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন ব্রুনো।

ধর্মযাজকরা ভেবেছিলেন এতেই কাজ হবে। ইউরোপে বিশ্বসৃষ্টি সম্বন্ধে তিনি এদ্দিন যা প্রচার করে এসেছেন তা যে ভুল, তিনি নিজেই তা স্বীকার করবেন।

কিন্তু ব্রুনো তখন নির্ভীক হয়ে গেছেন। সত্যদ্রষ্টা ঋষি তিনি। মৃত্যুর ভয়ে সত্যপথ থেকে পিছু হটলেন না।

তাঁর মৃত্যুদণ্ড হয়ে গেল।

মৃত্যু দণ্ডের আদেশ যখন তাঁকে পড়ে শোনানো হচ্ছে তখনও তিনি নির্ভীক কণ্ঠে হাসতে হাসতে বললেন: পরম করুণাময় ঈশ্বরের নামে দণ্ডাদেশ উচ্চারণ করতে গিয়ে তোমাদের গলা ভয়ে অমন কাঁপছে কেন!

বিশ্ব বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী কেপলার ব্রুনো সম্বন্ধে বিস্ময়ে অবিভূত হয়ে বলেছেন: এঁর লেখা পড়তে পড়তে আমার মনে হয়েছে যেন ভূতে-পাওয়ার মত তিনি মহাশূন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন; অসীম মহাশূন্যে—যার কেন্দ্র নেই, আদি নেই, অন্ত নেই।

পৃথিবীর মানুষ ব্রুনোকে ভুলতে পারে নি। রোমে গেলে দেখবে, বিজ্ঞানের স্বার্থে তিনি যেখানে অগ্নিদগ্ধ হয়ে জীবন বিসর্জন দিয়েছিলেন সেখানে তাঁর নামে একটা স্মৃতিস্তম্ভ আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। ব্রুনোর মৃত্যুর প্রায় তিনশ' বছর পরে এটা নির্মিত হয়।

পায়রা মটর ওয়ালার মেয়ে

শ্রীতারাপদ রাহা

কায়রো সহরে একটা লোক ছিল সে পায়রামটর বিক্রী করে সংসার চালাত। আল্লা তাকে তিনটি সন্তান দিয়েছিলেন,—তিনটিই মেয়ে। এতে অবশ্য সচরাচর কোন বাপের মন খুশি হয় না, মনে ক্ষোভ থেকে যায়, কিন্তু এ লোকটার মনে ক্ষোভ ছিল না, খোদার দানকে সে মাথা পেতেই নিয়েছিল, তিনটি মেয়েকেই সে খুব ভালবাসত। ভালবাসাটা সহজ হয়েছিল কারণ তিনটি মেয়েই

ছিল অপূর্ব সুন্দরী, ছোট মেয়ে জৈনা আবার তার উপর অতিশয় বুদ্ধিমতী। মেয়েদের নিজের চেয়ে একটু উঁচু ঘরে বিয়ে দেবার তার বড় সাধ, তাই তার উপার্জনের কিছুই সে আর বাঁচাতে পারত না, খেয়ে-পরে যা থাকত, তা মেয়েদের শিক্ষার জন্যই সে ব্যয় করত। মেয়েরা রোজ সকালে নাস্তা খেয়ে এক মেয়ে-কারিগরের কাছে রেশম আর মখমলের উপর সূঁচের কাজ শিখতে যেত। যেতে হ'ত তাদের সুলতানের বাড়ির পাশ দিয়ে, আর শুধু পাশ দিয়েই নয়, সুলতানের একমাত্র ছেলে তার ঘরের পথের দিকে যে জানলাটা খুলে রোজ বসে থাকত, তারই সামনে দিয়ে। হোক না পায়রামটর ওয়ালার মেয়ে, ঘোমটার ভিতর দিয়ে তিনটি সুন্দরী তরুণীর মুখের যেটুকু আভাস পাওয়া যায়, তাই দেখবার জন্যই নিস্কর্মা শাহাজাদার ঔৎসুক্যের অন্ত ছিল না। জানলার কাছাকাছি এসে তিন জোড়া হরিণ চোখও শাহাজাদার রকম-সকম দেখে কৌতুকে ঝলমল করে উঠত। শাহাজাদা তার জানলার ধারে ওদের দেখতে পেলেই বলে উঠত—সেলাম, পায়রামটর ওয়ালার মেয়েরা, সেলাম, তিনটি গোলাপের ডাল, সেলাম। বড় দু'টি বোন মুখের পর্দা একটু সরিয়ে ফিক করে হেসে পালিয়ে যেত। ছোট জৈনা ঘোমটাও সরাত না, হাসতও না, ধীর মন্থর পদে এগিয়ে যেত।

শাহাজাদা সেলাম ছাড়াও মাঝে মাঝে বাজে কথা বলে রসিকতা করতে চেষ্টা করত,—হয়ত বলত, বলি ও পায়রামটর ব্যাপারীর মেয়েরা, পায়রামটরের ব্যাবসা এখন কেমন চলেছে? দাম কত, কত লাভ থাকে গো তোমাদের? তখন কথা দিয়েই উত্তর দিত ছোটমেয়ে জৈনা: কি দরকার সাহেব, আপনার পায়রামটরের দর শুনে, পোকাখেকো ক্ষুদেপাখী হয়ে পায়রামটরের খবরে কাজ কি! শুনে, শাহাজাদার মুখে আর কোন কথা যুগাত না, তিন বোন তার রকম দেখে হেসে পালিয়ে যেত। একদিন শাহাজাদা ওদের সঙ্গে ওদের বংশের অমর্যাদাকর ঐ রকম রসিকতা করতে গেলে জৈনার জবাবটা একটু বেশি রকমের কড়াই হয়ে গেল, শুনে শাহাজাদার মুখ-চোখ রাঙা হয়ে উঠল। তিন বোনের মাঝে এই ছোটটির দিকেই শাহাজাদার একটু ঝোঁক ছিল বেশি, হাল্‌কা কথা বলে যখন কিছুতেই ওর মন নরম করা গেল না, তখন ভারী কিছু করে ওকে সায়েস্তা করা দরকার। কিন্তু কি করা যায়?—ভেবে ভেবে ঠিক করলে, ওদের বাপকে কিছু বিপদে ফেলা যাক, তাহ'লেই ছোট মেয়ে জব্দ হবে, বাপকে ও সব চাইতে বেশি ভালবাসে। এমনি যখন ওর মন জয় করা গেল না, তখন ক্ষমতা প্রয়োগ করেই দেখা যাক।

পরের দিনই শাহাজাদা ডেকে পাঠালে পায়রামটর ওয়ালাকে। মটরওয়ালা এসে কুর্নিশ করে দাঁড়ালে, শাহাজাদা বললে—যে তিনটি মেয়ে রোজ আমার ঘরের সামনে দিয়ে সূঁচের কাজ শিখতে যায় তাদের বাপ না তুমি?

মটর ব্যাপারী ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললে—জি, হুজুর।

শাহাজাদা অমনি চোখ পাকিয়ে বললে—বেশ, কাল সকালে নামাজের সময় এখানে হাজির হবে তুমি,—হাজির হবে এক সঙ্গে পোষাক পরে এবং না পরে, একই সঙ্গে হেসে এবং কেঁদে, তা ছাড়া একই সঙ্গে গাধায় চড়ে এবং পায়ে হেঁটে, এ যদি না পারো তুমি, দু'টি পেরে একটিও যদি না পারো, তাহ'লে তোমার গর্দানা নেব আমি।

শাহাজাদার হুকুম শুনেই ত মটরওয়ালার 'হয়ে' গেল। তার পর কোন রকমে সামনের মাটিতে ঠোঁট ছুঁইয়ে কুর্ণিশ করে আঁধার মুখে চোখের জল ফেলতে ফেলতে বাড়ি ফিরে এল। বাপকে এই অবস্থায় আসতে দেখেই মেয়েরা ছুটে এল। ছোট মেয়ে জৈনা বাপের হাত ধরে বললে—কি হয়েছে বাপজান, মুখ এত আঁধার কেন, চোখে জল কেন ?

আর মা, কি হয়েছে, আমার 'হয়ে' গেল। যা কখনও হয় না, হবার নয়, কাল সকালে তাই আমার করবার হুকুম দিলেন শাহাজাদা—তার সামনে না পারলে গর্দানা !

কি করতে হবে খুলেই বলো না বাপু।

বাপ তখন শাহাজাদার তিনটি বেয়াড়া হুকুমের কথাই মেয়েকে খুলে বললে। শুনে জৈনা খিল-খিল করে হেসে উঠল : কিচ্ছু ভয় নেই, এর সব ব্যবস্থাই করে দিচ্ছি আমি। আমার কথা শুনে চললে, এর সব কিছুই তুমি পারবে।

শুনে মেয়ের মুখের দিকে বাপ ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল,—বলিস কি তুই।

হাঁ গো, হাঁ। সব, সব পারবে তুমি। শোন না বলছি—কি কি করতে হবে তোমায় : প্রথমেই যাও তুমি তোমার দোস্ত কেয়ামৎ জেলের বাড়ি। গিয়ে তার জালটা চেয়ে নিয়ে এস তুমি। তাই দিয়ে আজ রাত্রের মাঝেই তোমার দিব্বি একটা পোষাক তৈরী করে দেব আমি। ওটা পরে গেলে এক সঙ্গে পোষাক পরা এবং না পরা দুই-ই হবে। দ্বিতীয়টার জন্যে কিছুই ভাবতে হবে না, তোমার বাড়িতেই তা আছে। যাবার সময় রান্নাঘর থেকে একটা পেঁয়াজ হাতে করে যাবে তুমি। ঐ মুর্খটার সামনে যাবার একটু আগে শুধু চোখে ঘষে নিয়ে হাসতে হাসতে যেও ; বাস্, এক সঙ্গে হাসি কান্না দুই-ই চলবে। তৃতীয়টার জন্যে তোমায় যেতে হবে রসুন ব্যাপারী করিমদ্দির বাড়ি। ওর গাধাটার হালে বাচ্ছা হয়েছে, সেই বচ্ছাটা চেয়ে আনবে তুমি। সেটা এত ছোট যে তার উপর বসার ভঙ্গী করে তুমি অনায়াসে পায় হেঁটে যেতে পারবে। কেমন, এখন হ'ল ত বাপজান ? এই সব কয়টা 'খেল' দেখিয়ে তোমার শাহাজাদাকে দিব্বি বোকা বানিয়ে দিয়ে আসতে পারবে তুমি।

শুনে বাপের মনের সকল ভয় কেটে গেল, দিলটা হালকা হ'ল, মুখে হাসি ফুটে উঠল, মেয়ের কপালে চুমু খেয়ে সে বললে—সাবাস বেটি, সাবাস তোর বুদ্ধি, আল্লা এমনি মেয়ে দেন যাকে, তার মৃত্যু নেই।

মনের স্বস্তি ফিরে পেয়ে বাপ মেয়েদের সঙ্গে খানাপিনা করলে, তারপর গেল কেয়ামতের বাড়ি জাল আনতে, গেল করিমদ্দির বাড়ি গাধার বাচ্চা চাইতে, পেঁয়াজ ত বাড়িতেই আছে।

পরদিন ভোরে নামাজের সময় শাহাজাদা তার বন্ধুদের নিয়ে অপেক্ষা করছিল তিন মেয়ের বাপ পায়রা-মটরওয়ালা কখন আসে। ভাবছিল, এইবার মজাটা টের পাবে তার ছোট মেয়ে, শাহাজাদার সঙ্গে লাগতে যাওয়ার ফল বুঝবে—এমন সময় এসে হাজির হ'ল মটর-ব্যাপারী—পোষাক পরে অথচ পোষাক না পরে, হেসে অথচ কেঁদে, গাধার পিঠে চড়ে অথচ হেঁটে। দেখে ত শাহাজাদার দম ফাটবার যোগাড়। এদিকে গাধার বাচ্চাটা এতগুলি লোকের মাঝে এসে পড়ে কি বিকট চীৎকার,—সঙ্গে সঙ্গে পিছন থেকে সশব্দে দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে। বন্ধুদের মাঝে লজ্জায় মুখ চুন হয়ে গেল শাহাজাদার।

তিনটিই ঠিক ঠিক করতে পেরেছে ব্যাপারী, তাই বাধ্য হয়ে ছেড়ে দিতে হ'ল তাকে। সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে ভাবনা শুরু হয়ে গেল শাহাজাদার—কি করে এর প্রতিশোধ নেওয়া যায়। এবার আর বাপকে নয়, এবার মেয়েকে নিয়েই পড়তে হবে।

মেয়ে জৈনা তা জানে, বুদ্ধি আছে তার, ভবিষ্যৎ দৃষ্টিও আছে। তাই শাহাজাদা তাকে জব্দ করবার কোন উপায় খুঁজে বের করবার আগেই নিজের কর্তব্য সে ঠিক করে ফেললে। আক্রান্ত হয়ে আত্মরক্ষার উপায় খুঁজে বের করবার চেয়ে, আক্রমনটা নিজের তরফ থেকে প্রথম করাই ভাল—এই তার মত। সে তখনই বাজারে সবচেয়ে বড় বর্মনির্মাতার দোকানে গিয়ে বললে—ওস্তাদ চাচা, আমার যে জলদি একটা ইস্পাতের বর্ম চাই। আমার হাত-পা, বুক-মুখ, মাথা সব ঢাকা পড়বে এতে, শুধু তাই নয়, চলতে গেলে কিম্বা একটু ছোঁয়া লাগলেই এ থেকে এমন ভয়ংকর আওয়াজ বেরুনো চাই যে, শুনলে কানে তালা লেগে যায়। তুমি ছাড়া এ তো আর কেউ করতে পারবে না চাচা, তাই তোমার কাছে এলাম, যত দিরদাম লাগে দেব।

ঠিক আছেরে বেটি, বিকেলর দিকে এসে নিয়ে যাস। জৈনার সুন্দর মুখের মিষ্টি বুলি শুনে ওস্তাদ কারিগর ঠিক সময়েই তা করে দিল। রাত্রি প্রহরখানেক উৎরে গেলে সেই বর্ম পরে একখানা ক্ষুর, একখানা কাঁচি আর গাঁইতি হাতে করে জৈনা রওয়ানা হ'ল সুলতানের বাড়ির দিকে। তার এই অদ্ভুত বেশ দেখে আর বর্মের আওয়াজ শুনে দ্বার ছেড়ে দ্বারী পালাল, খোজা বানদা যত ছিল সব পালাল, জৈনা নির্বিবাদে দরজা পেরিয়ে বারান্দা পেরিয়ে হাজির হ'ল শাহাজাদার ঘরে। শাহাজাদা তখন আলো স্তিমিত করে শোয়ার আয়োজন করছিল। হঠাৎ ঘরে এই ভয়ংকর অদ্ভুত বেশধারীকে দেখে বুকের স্পন্দন বুঝি তার বন্ধ হয়ে গেল, ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বর্মধারী ছদ্মবেশী জৈনার সুমুখের মাটি চুম্বন করে সে বললে—দোহাই বাবা ইস্করিৎ, আল্লার দোহাই আমাকে রেহাই দাও, আল্লাও তা হ'লে তোমায় রেহাই দেবেন।

জৈনা কৃত্রিম ভয়ঙ্কর আওয়াজ তুলে বললে,—চুপরও, বদখত, বেতমিজ, সয়তান, একটিও কথা বলবে না। একটি শব্দ করলে—এই যে দেখছ গাঁইতি এই দিয়ে তোমার চোখ ছেঁদা করে দেব।

শুনে শাহাজাদা ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে চুপ করে পড়ে রইল, আর জৈনা ক্ষুর দিয়ে তার কচি গোঁফের ডান দিকটা, দাড়ির বাঁ দিকটা, আবার চুলের ডান দিকটা—আর দু'টো ভুরু কামিয়ে কিছুটা গাধার পুরীষ তার মুখে চোখে ঘষে কিছুটা খাইয়ে বর্মের বিকট আওয়াজ তুলতে তুলতে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে গেল, ভয়ে কেউ তার চোখের সামনেও এল না। বাড়ি গিয়ে বর্ম খুলে লুকিয়ে বোনেদের সঙ্গে শুয়ে স্বস্তিতে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন ভোরে যথা সময়ে তিন বোনই সেজেগুজে সেলাইয়ের সরঞ্জাম নিয়ে রওয়ানা হ'ল তাদের শিক্ষাদাত্রীর বাড়ির উদ্দেশ্যে। পথে সুলতানের বাড়ির কাছে এসে দেখে শাহাজাদা রেশমী কাপড়ে মুখ মাথা ঢেকে মাত্র চোখ দু'টি খোলা রেখে তার ঘরের জানলার ধারে বসে আছে। তিন বোনই আজ ভাল করে তাকিয়ে দেখতে লাগল তাকে, কৌতুকে হাসি হাসি মুখেই তাকাতে লাগল। দেখে শাহাজাদার মনে হ'ল আজ এদের মন নরম হয়েছে, ভাল লেগেছে আমায়। তাই হবে, আমার মুখ ঢাকা, শুধু চোখ বাইরে। আমার চোখ দু'টি নিশ্চয় সুন্দর, তাতেই আকৃষ্ট হয়ে ওরা তাকাচ্ছে। এই ভেবে শাহাজাদা তখন খুশি মনে তার নিত্য অভ্যাস মত ওদের একটু মধুর সম্ভাষণ করে বললে—ও আমার নয়নের আলো মেয়েরা, ও সোজা গোলাপের ডালেরা, আজ সকালে পায়রা মটরের খবর কি ?

যেই বলা, অমনি জৈনা তার মুখের আবরণ সরিয়ে মাথা উঁচু করে বললে—সেলাম, মুখ ঢাকা সাহেব, আজ ভোরে আপনার দাড়ি গোঁফের খবর কি, ভুরুর খবর কি, মাথার চুলের খবর কি, গাধার ও জিনিসটা কেমন লেগেছে, হৃদয়ে আনন্দ পেয়েছেন নিশ্চয় !

শুনে শাহাজাদার সারা শরীরটা মোচড় দিয়ে উঠল, হাত-পা একেবারে অবশ হয়ে এল, বুঝলে কা'ল রাত্রে এই জৈনাই ইফরিদ সেজে এই কাণ্ড করে গেছে, আরও বুঝলে এর সঙ্গে সন্ধি না করতে পারলে, ভাব না করতে পারলে তার মৃত্যু নিশ্চিত।

শাহাজাদা কোনরকমে তার দাড়ি, গোঁফ, চুল, ভুরু নতুন করে ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করলে, তারপর ওগুলি ঠিক মত উঠলে ডেকে পাঠালে পায়রা মটরওয়ালাকে। মটরওয়ালা এসে সেলাম করে দাঁড়ালে শাহাজাদা বললে—শোন ব্যাপারী, তোমার ছোট মেয়েটাকে আমার বড় পছন্দ, ওকে সাদী করতে চাই আমি। এতে তুমি রাজী না হলে তোমার গর্দানা নেব আমি।

ব্যাপারী বললে—শাহাজাদা, এ অধিকার ত আপনার আছেই, তবে কিনা সাদীর ব্যাপারে—যার সঙ্গে সাদী সেই মেয়েকে একবার জিজ্ঞাসা করে তবে উত্তরটা দিতে চাই আমি।

এ তো বেশ ভাল কথা, তাকে জিজ্ঞাসা করেই তুমি তোমার উত্তর দাও। তবে হাঁ, এ কথাও বলে রাখছি যে, সে যদি রাজী না হয় তবে একসঙ্গে বাপ-বেটি দু'জনারই গর্দানা যাবে তোমাদের,—এ কথা মনে রেখো।

ব্যাপারী সে কথা মনে রেখেই ভাবতে ভাবতে বাড়ি এল, এসে জৈনাকে খুলে বললে সব কথা। শুনে ছোট মেয়ে বললে— এ তো বেশ ভাল কথা, বাপজান, এ তো সৌভাগ্যের কথা। খোদার দোওয়া না থাকলে এ রকম প্রস্তাব ত আশাই করা যায় না, তুমি বলে এস,—আমি রাজী, সানন্দে রাজী।

বাপ, শাহাজাদার কাছে সুখবরটা দিতে রওয়ানা হলেই জৈনা ছুটল বাজারের এক ওস্তাদ কারিগরের কাছে— যে চিনি দিয়ে নানারকম খেলনা, পুতুল তৈরী করে। গিয়ে সেলাম করে বললে, —চাচা, তুমি ত চিনি দিয়ে আঙুলের খেল দেখাও, আমায় একটা চিনির পুতুল তৈরী করে দাও দেখি —যত লাগে দেব। ওটা দেখতে হবে আমারই মত বড়, আমারই মত নাক, মুখ, হাত-পা সব, আর যেখানকার যা রঙ, এমন করে বানাবে যে দেখলে মনে হবে ঠিক আমি।

—ঠিক আছে বেটী, বলে ওস্তাদ তখনই চিনি গলিয়ে মূর্তি গড়তে শুরু করল। যখন শেষ হ'ল, মনে হল ঠিক যেন আর একটা জৈনা, শুধু তার মত কথা বলতে পারে না।

যথা সময়ে মহা আড়ম্বরে শাহাজাদার সঙ্গে জৈনার সাদী হয়ে গেল। জৈনা তার দুই বোনের সাহায্যে পুতুলটাকে নিজের জামা-কাপড় পরিয়ে ঠিক নিজের মত করে ওকে নিয়ে শুইয়ে দিল বিছানায়, চারিদিকে হালকা পরদা টাঙিয়ে দিল, তারপর নিজে লুকিয়ে রইল যেখানে লুকানো যায়। বড় দুই বোন ছোটর শেখানো মত শাহাজাদাকে সম্বর্ধনা করে এনে বাসর ঘরে ঢুকিয়ে বললে—শাহাজাদা, আমাদের শান্ত কোমল মিঠু বোনটিকে আল্লা ভরসা করে আপনার হাতে দিয়ে গেলাম, একটু দরদ যেন ও পায় আপনার কাছ থেকে,—বলেই তারা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

শাহাজাদা দরজা বন্ধ করে বিছানার কাছে এগিয়ে গেল, হালকা পরদার ভিতর দিয়ে দেখল : এই ত জৈনা দিব্বি চুপ করে শুয়ে আছে। এবার হাতের মুঠোর মাঝে পাওয়া গেছে। মুহূর্তে মনে পড়ে গেল ওর দেওয়া লাঞ্ছনা গঞ্জনা টিটকারির কথা, সে সব কি ভুলেছে শাহাজাদা? এবার? এবার কে রক্ষা করে ওকে? রাগে কাঁপতে কাঁপতে শাহাজাদা তার মস্ত বড় তলোয়ারখানা খাপ থেকে বের করে দিলে বিছানায় শায়িতা কনের গলায় জব্বর এক কোপ। মুণ্ডটা ছিটকে বেরিয়ে গেল ধড় থেকে! তারই একটু ভাঙা টুকরো হঠাৎ এসে পড়ল শাহাজাদার মুখের মাঝে, কোপের সঙ্গে সঙ্গে অভিশাপ দেবার জন্যে হাঁ করেছিল তখন।

: আরে, দিব্বি মিষ্টি যে! বেঁচে থাকতে যে আমায় দুর্গন্ধ গাধার নাদ খাইয়েছে, মরবার সময় সে কি না সুগন্ধ মেঠাই খাইয়ে গেল। এ আমি কি করলাম! অনুতাপে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে শাহাজাদা

সেই তলোয়ারখানা নিজের পেটে বসাতে যাচ্ছিল—এমন সময়ে সত্যিকার জৈনা এসে হাসিমুখে তার হাত চেপে ধরল : পাগল, এ কি করতে আছে? আমিও তোমায় ক্ষমা করি, তুমিও আমায় ক্ষমা করো, তাহ'লে আল্লা আমাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করবেন।

শুনে বাঁচল শাহাজাদা। এইবার যেন প্রথম দেখল জৈনার মুখখানাও মিষ্টি, হাসিটাও মিষ্টি। সেই মুহূর্তে সে আগেকার সকল তিক্ততা ভুলে গেল। তখন থেকে তারা দুইজন পরস্পরকে গভীরভাবে ভালবাসলে, আর শেষে খোদার কাছে যাবার আগে অনেক সন্তানসন্ততি রেখে গেল। *

* আরব্য রজনীর একটি ছোট গল্প।

চাঁদ পড়েছে ফাঁদে

শ্রীনবগোপাল সিংহ

(১)

সম্পাতিটার পুড়লো পাখা
সূর্য্য অভিযানে,
গরুড় গেলো চন্দ্রলোকে
অমৃত সন্ধানে ;
এসব হ'লো পৌরাণিকী কথা,
পক্ষবিহীন ধরার মানব
উড়লো চাঁদের দেশে
ভাসিয়ে নব যন্ত্র-দানব
নামলো আবার এসে।
রূপকথা নয়, সত্য এ বারতা।

(২)

"আকাশ ভরা সূর্য্য তারা"
গ্রহ উপগ্রহ
মানুষ তাহার পথের খবর
করেছে সংগ্রহ।
কোথায় আজি পৌঁছেছে বিজ্ঞান ?
বিশ্ব যে আজ বিস্ময়েতে
হঠাৎ হ'লো মূক,
অসাধ্যকে সাধতে মানুষ
নয় তো পরাঙ্মুখ,
এ অভিযান দিলো তার প্রমাণ।

(৩)

মাটির অভিকর্ষ ছাড়ি
নামলো চাঁদের কোলে,
পৃথিবীকে দেখলো যেন
আর একটি চাঁদ ঝলে,
চাঁদকে তারা করলো পরিক্রমা
তিন লক্ষ মাইল থেকে
বার্তা বিনিময়
চাঁদের ছবি পাঠায় তারা
এ আরো বিস্ময়,
বাস্তবে আজ ডুবলো যে কল্পনা

(৪)

চাঁদের বুড়ি কদমতলায়
কোথায় সুতো কাটে ?
চাঁদের মৃগ কোথায় ? সুতো
বিকোয় সে কোন্ হাটে ?
আকাশচারী হতাশ হয়ে পড়ে।
সজীবতার চিহ্ন তো নেই
উষর মরুর মত—
লক্ষ শত উল্কাপাতে
অঙ্গে হাজার ক্ষত,
সুধার সাগর কোথায় চাঁদের ক্রোড়ে ?

(৫)

সোনা, রূপো, অভ্র আছে,
কিম্বা আছে তামা ?
মহাকাশের যাত্রী দেখে
একটা পাহাড় ঝামা।
কোথায় সবুজ বৃক্ষলতার ছবি ?
এই চাঁদেরই কিরণ পেলে
ধরার সাগর নাচে,
কুমুদ খোলে আঁখি, চকোর
চন্দ্রসুধা যাচে
জোছ্‌নালোকে কাব্য রচে কবি।

(৬)

কল্পলোকের সে চাঁদ আজি
পড়লো ধরার ফাঁদে
টিপ্‌ দিতে আর আসবে না সে
মায়ের খোকন চাঁদে ;
লজ্জা পেয়ে হ'য়েছে আজ ম্লান ;
পৃথিবীরই অংশ ও যে
হঠাৎ গেছে স'রে
মানুষ ভালোবাসতে যে চায়
তাই তো আপন ক'রে,
এ অভিযান তাহারই আহ্বান।

বীজ থেকে

শ্রীচুনীলাল রায়

ফুল, ফল, বীজ—আবার বীজ থেকে জন্ম নেয় নতুন মহীরুহ। নতুন প্রাণের স্পন্দন লুকানো থাকে বীজের মধ্যেই।

শুধু তাই বা কেন, মানুষও বীজ থেকে জোগাড় করে নিচ্ছে নিজের জীবনধারণের প্রধান উপকরণগুলি। 'বীজ থেকে' আজ মানুষও পাচ্ছে যেন নবজীবনের সাড়া।

খাদ্য বিশেষজ্ঞরা আজকাল মনে করেন যে, চীনাবাদাম, সয়াবীন, সীম, তিলবীজ, সূর্যমুখী ফুলের বীজ থেকে যে তেল পাওয়া যায় তার সঙ্গে যদি নারিকেল তেল বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে ভালভাবে মিশিয়ে নেওয়া হয়, তবে তা' ভাল খাদ্য হিসাবেও ব্যবহার করা চলতে পারে। এই খাবার থেকে দুধের সমপরিমাণ প্রোটীন পাওয়া যাবে বলেও তাঁরা মনে করছেন। অথচ এর জন্য খরচ হবে দুধের থেকে অনেক কম।

আজ পৃথিবী জুড়ে প্রোটীন-জাত খাদ্যের খুব অভাব দেখা দিয়েছে। তেল-বীজকে কাজে লাগিয়ে এই অভাব একদম দূর করে ফেলা একদিন সত্যি-সত্যিই সম্ভবপর হবে।

এ'ছাড়া বিজ্ঞানীরা তুলাবীজ থেকে প্রোটীন সমৃদ্ধ ময়দা তৈরী করার এক নতুন উপায় বের করেছেন। এখনই ময়দার তৈরী জিনিষ যেমন পাঁউরুটী, বিস্কিট্ প্রভৃতিকে আরও পুষ্টিকর করে তোলার কাজে এ'পদ্ধতির সাহায্যে নেওয়া হচ্ছে।

যে সব দেশে প্রচুর তুলা জন্মায় সে সব দেশে তুলার বীজ থেকে প্রচুর প্রোটীন-সমৃদ্ধ ময়দা পাওয়া যেতে পারে।

অক্লান্ত গবেষণার ফলে তাঁরা দেখেছেন যে, প্রতি ১০০ টন তুলাবীজ থেকে এ রকম ৩৬,০০০ পাউণ্ড পর্যন্ত প্রোটীন-সমৃদ্ধ ময়দা পাওয়া যাবে। এই ময়দা খেতেও খুব ভাল লাগে আর এতে প্রোটীন থাকে শতকরা ৬৫ ভাগ।

এক হিসাবের ফলে দেখা গিয়েছে যে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র প্রতি বছর এই রকম ময়দা তৈরী করতে পারে ২০ লক্ষ টন। আর পৃথিবীর অন্যান্য দেশে এ'রকম ময়দা তৈরী হতে পারে ৬০ লক্ষ টন।

যে পদ্ধতিতে এই ময়দা তৈরী করা হয় তাকে বলে লিকুইড সাইক্লোন প্রসেস বা এল সি. পি।

এই পদ্ধতিতে তুলাবীজের তেল বের করে নিয়ে শাঁসটাকে যান্ত্রিক উপায়ে দুই ভাগে ভাগ করে ফেলা হয়।

শাঁসের বড় অংশে শতকরা প্রায় ৬৫ ভাগ প্রোটীন থাকে। একে মিহি করে পিষে নিলে ময়দা পাওয়া যায়। হাল্‌কা ঘি-রংয়ের এই ময়দার গন্ধও খুব ভাল।

এ'ছাড়া, সাধারণ ময়দার সংগে এই ময়দা মিশিয়ে তার প্রোটীনের পরিমাণও বাড়ানো যায় সহজেই।

শাঁসের ছোট অংশটাও কিন্তু একেবারে নষ্ট হয় না। তাকে পশুর খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

আমাদের দেশেও আজ এই পদ্ধতির প্রয়োগ শুরু হচ্ছে।

এ' ছাড়া, বীজ থেকে যে খুব দরকারী ভাল ওষুধও তৈরী করা যেতে পারে একথা শুনলে তোমরা নিশ্চয়ই অবাক হয়ে যাবে।

কিন্তু একথা আজ আর বিন্দুমাত্রও কল্পনা নয়। মানুষের অক্লান্ত প্রয়াস আর কঠোর সাধনাতে সত্যিই এমন জিনিষ আবিষ্কার করা সম্ভবপর হয়েছে।

আর এ হ'ল দু'জন আমেরিকান বৈজ্ঞানিকের সাধনার ফল। এঁরা হলেন উত্তর ডাকোটা স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের জীবাণু তত্ত্ববিদ ডাঃ জে. এল. পোরসল্স এবং এইচ. জে. ক্লস্টারম্যান।

তিসির বীজকে নতুন কাজে লাগাবার কথা তাঁরা চিন্তা করছিলেন। আর তারই যথার্থ ফলশ্রুতি হ'ল মানুষ ও পশুর কয়েক রকম দুরারোগ্য অসুখ সারাবার কাজে ব্যবহারের উপযোগী এক শক্তিশালী অ্যান্টিবায়োটিক, যার নাম তাঁরা দিয়েছেন—'লিনাটিন'।

এই ওষুধটি স্যালমানেল্লা টাইফিমুরিয়াম নামে যে বীজাণু পশু ও মানুষের অন্ত্রে কঠিন ব্যাধি জন্মায়, তার যথাযথ প্রতিষেধক হতে পারবে বলে তাঁরা আশা প্রকাশ করেছেন।

লিনাটিন কোন্ বীজাণু ধ্বংস করতে বা তার বংশবৃদ্ধিতে বাধা দিতে সক্ষম বৈজ্ঞানিকরা তা' নিয়েও আজ গবেষণা চালাচ্ছেন।

এভাবে নানা রকমের বীজকে আজ কাজে লাগাবার উপায় বের করার জন্য বৈজ্ঞানিকেরা কঠোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

পুরস্কার

মদন চৌধুরী

পলাশপুর গ্রামের স্বামীজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীচপলাকান্ত চক্রবর্তী মহাশয় নবম শ্রেণীতে সেদিন স্কুল বসার সঙ্গে সঙ্গে একজন ভদ্রলোককে নিয়ে ঢুকলেন। ছেলেরা সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল। মুখ চাওয়া-চায়ি করল পরস্পরে।

প্রধান শিক্ষক মহাশয় ছেলেদের লক্ষ্য করে বললেন—আজ হ'তে এই নতুন মাষ্টার মশাই তোমাদের বাংলা পড়াবেন। 'আমি আশা নিয়ে যাচ্ছি ইতিপূর্বে তোমরা শিক্ষকদের প্রতি যে শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখিয়েছ—সে কথা স্মরণ রাখবে।'

ছেলেরা নীরবে মাথা নামিয়ে সম্মতি জানাল। প্রধান শিক্ষক মহাশয় বেরিয়ে গেলেন। নতুন মাষ্টার মহাশয় বসলেন না, ঘুরে ঘুরে ছেলেদের পরিচয় নিলেন; রোল-কল করলেন, পরে অত্যন্ত মিষ্টি গলায় জিজ্ঞেস করলেন—'বাংলার কি বিষয় আজ পড়া আছে?'

একটি ছেলে উঠে দাঁড়াল। বিনম্র গলায় বললে—'প্রতিভা।' নতুন শিক্ষক অতি সুন্দর ও সরলভাবে সেটা ছেলেদের বুঝিয়ে দিলেন। ছেলেরা খুশী। এ ধরণের বাংলা পড়ানো এই প্রথম ছেলেরা শুনল।—অপূর্ব।

—আগামী কাল কি আছে?

—রচনা।

নতুন মাষ্টার মহাশয়ের চোখ-মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল। তিনি ধীরে ধীরে 'ব্ল্যাক্-বোর্ডের' দিকে

এগিয়ে গিয়ে চক নিয়ে পরিষ্কার গোটা গোটা করে লিখলেন—

'জীবে প্রেম করে যেই জন,
সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।'

লেখা শেষ করে ছেলেদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন—নিশ্চয় তোমরা জান, এ কথাগুলো কে বলেছেন।

—বিবেকানন্দ।

—বেশ, এ দু'লাইনের ওপর তোমাদের বক্তব্য লিখে এনো আগামী কাল। দেখবো। এবং যার লেখা সবদিক দিয়ে উৎকৃষ্ট হবে তাকে আমি একটা 'পার্কার পেন' উপহার দেব।

সমস্ত ক্লাসে একটা চাপা গুঞ্জন উঠলো। পার্কার পেন! অদ্ভুত তো! এ ধরণের কথা কোনদিন কোন শিক্ষকই বলেন নি।

নতুন শিক্ষক একদিনেই ছাত্রদের কাছে প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন। শ্রদ্ধা কুড়িয়ে নিয়ে গেলেন। তা' ছাড়া মুখে মুখে কথাটা সারা বিদ্যালয়ে ছড়িয়ে পড়তেও দেরি হোল না। শিক্ষকগণের মধ্যেও নতুন মাষ্টার মহাশয় বিশেষ এক আলোচনার খোরাক হ'য়ে উঠলেন।

পরদিন । নবম শ্রেণীর ছাত্ররা অধীর উৎকণ্ঠা নিয়ে ঘড়ি দেখছে। যথাসময়ে বৃদ্ধ মালী দুর্গাপদ ঘড়িতে ঘা দিলে। সমস্ত বিদ্যালয়ে নেমে এল এক অখণ্ড নীরবতা।

ঠিক সময়ে নতুন মাষ্টার প্রণবেশ চৌধুরী ধীর শান্তভাবে ক্লাসে ঢুকলেন। ছেলেরা উঠে দাঁড়াল। তাদের বসবার ইঙ্গিত দিয়ে রোল-কল সারলেন। আশ্চর্য! একটি ছেলে ছাড়া আজ সকলেই ক্লাসে এসেছে। মনে মনে প্রণবেশ চৌধুরী বেশ উৎফুল্ল হলেন। ছেলেদের ভালবেসে মন জয় করার যে আনন্দ সেই আনন্দে ভরপুর হয়ে উঠল প্রণবেশ চৌধুরীর হৃদয়।

সারা ক্লাসের ছেলেরা স্তব্ধ বিস্ময় নিয়ে তাদের নতুন মাষ্টার মশাইয়ের দিকে তাকিয়ে ছিল। পকেট থেকে প্রণবেশ চৌধুরী একটি সৌখিন বাক্স বের করলেন। এবং বাক্সটি খুলে ঝক্‌ঝকে পার্কার পেনটি বের করে ছেলেদের দেখালেন।

ছাত্ররা একে একে তাদের স্বাধীন বক্তব্য শোনালে। প্রণবেশবাবু আত্মমগ্ন হ'য়ে শুনলেন, কি যেন কাগজে লিখে রাখলেন।

সকল ছেলেরই পড়া প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে, এমন সময় প্রণবেশ চৌধুরী ক্লাসের শেষ বেঞ্চিটার দিকে তাকিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। ধীরে ধীরে ছেলেদের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেলেন সেদিকে। ছেলেরা ভয়, বিস্ময়, উৎকণ্ঠা নিয়ে তাকিয়ে রইল সেদিকে। তাদের ক্লাসের একটি ছেলে প্রশান্ত বেঞ্চে মাথা রেখে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। কি সর্বনাশ!

প্রণবেশবাবু ছেলেটির সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। সস্নেহে তার মাথায় একখানা হাত রেখে ডাকলেন—তুমি ঘুমোচ্ছ?

সাড়া নেই। গভীর ঘুমে ছেলেটি মগ্ন। পাশের ছেলেটি নাম ধরে ডাকলো—প্রশান্ত, মাষ্টারমশাই কি বলছেন—

ঘুম ভেঙ্গে গেল প্রশান্তর। চোখ মেলেই সে দেখল তার সামনেই প্রণবেশবাবু দাঁড়িয়ে আছেন।

—তুমি ক্লাসে ঘুমোচ্ছিলে ?

লজ্জায়, অপমানে প্রশান্ত মাথা নামিয়ে মহা অপরাধীর মত দাঁড়িয়ে রইল।

প্রণবেশবাবু প্রশান্তর মুখের দিকে তাকিয়েই যে ছবি দেখেছিলেন তা বেদনায় আঁকা—বিবর্ণ। চোখদু'টো লাল, মুখখানা অনিদ্রার কালিমায় কলঙ্কিত। চুল কাকের বাসার মত অগোছাল, এলোমেলো।

—কি হয়েছে তোমার প্রশান্ত ?

প্রশান্ত অদ্ভুত এক দৃষ্টি নিয়ে প্রণবেশবাবুর মুখের দিকে তাকাল। কি ধারালো সে দৃষ্টি। এতটুকু ভয় নেই। উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার মেঘ ঝড় দিয়ে যেন এই মাত্র উড়িয়ে নিয়ে কোথায় চলে গেছে। নির্মল আকাশ।

—প্রশান্ত, তোমার কি শরীর খারাপ ?

—না।

—তুমি নিশ্চয় ভাবসম্প্রসারণটা লিখে এনেছ ?

—সময় পাইনি স্যার।

—সময় পাওনি, কেন ?

— শ্মশানে যেতে হয়েছিল আমাকে। সেখানে সারারাত—

— শ্মশানে !

—আমাদের পাড়ার এক বিধবা মহিলার একমাত্র ছেলে হঠাৎ গত রাত্রে কলেরায় মারা গেল স্যার। রোল-কল করবার সময় ঐ যে বিজনের নামটা পেলেন না। বিজন আর কোনদিন উপস্থিত থাকতে পারবে না !

—বিজন ! সমস্ত ক্লাস স্তম্ভিত।

— কলেরা সংক্রামক রোগ ; তার উপর ওরা ছিল বড় গরীব।

—তারপর ? প্রণবেশবাবু অধীর হ'য়ে জানতে চাইলেন।

—ছেলেটিকে কেউ দাহ করতে এগিয়ে এল না। একটি পয়সা দিয়েও কেউ সাহায্য করলে না।

—তুমি একা গিয়েছিলে শ্মশানে ?

—আমি ও বাবা দু'জনে গিয়েছিলুম। সকালে ফিরেছি। আপনি বিশ্বাস করুন স্যার, সময় অভাবেই আমি লিখতে পারি নি।

—তুমি আমার সঙ্গে এস প্রশান্ত।

—কোথায়? চোখ-মুখ বিবর্ণ হ'য়ে উঠলো প্রশান্তর।

—পুরস্কার নেবে না?

—পুরস্কার! আমি তো লিখেই আনিনি।

—এনেছ, চল পার্কার পেন নেবে।

—আমি! থরথর করে কেঁপে উঠলো প্রশান্তর গলা।

প্রণবেশ চৌধুরী প্রশান্তর মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন,—হ্যাঁ তুমিই। তোমার লেখাই সবদিক থেকে উৎকৃষ্ট হয়েছে। সারা ক্লাসের ছেলেদের আমি জিজ্ঞেস করছি।

সমস্ত ক্লাস বোবা, পাথর।

—প্রশান্ত! স্বামীজীর বাণীকে তুমি মূর্ত করেছ, প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছ; তুমিই তো এই পুরস্কার পাওয়ার অধিকারী!

প্রশান্ত একটি কথাও বলতে পারল না। কেবল তার চোখ ফেটে জলের ধারা নামল।

তিন সত্যি ঃ টিক্ টিক্ টিক্

ভুবনেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

টিকটিকিরে টিক্‌টিকি
সত্যি করে বল দিকি—
পিঁপড়েগুলোর পাখা গজায়
মরবে বলে সত্যি কি?
বিশ্রী শুঁয়ো পোকা থেকেই
প্রজাপতির জন্ম কি?

টিক্ টিক্ টিক্ টিকটিকি
সব কথাতেই সায় দেখি!
কাকের বাসায় ডিম পাড়ে কে,
—কোকিল—সেটা জান্‌তে কি?

বল্‌তে পারো কোন সে প্রাণী
চোখ বোঁজে না, নিদ্রা যায়?
সে প্রাণী মাছ—ঠিক বলি নি?
টিক্ টিক্ টিক্—দিচ্ছে সায়!

পুরাণের পাতা থেকে

ভীম শঙ্কর

শ্রীশতদ্রুশোভন চক্রবর্তী

একটি বালকের দীর্ঘশ্বাসে বিজন পার্বত্য-প্রদেশ আকুলিত হয়ে উঠল। সহ্যপর্বত। পাষাণ, পাষাণ এবং পাষাণ। পাষাণের বুকেও হয়ত সাড়া জাগল। ন'ইলে বায়ু এত মন্থর কেন? ন'ইলে গাছে গাছে পাতায় পাতায় কেনই বা এত বিষন্নতা?

সহ্যপর্বতে একটি বালকের দীর্ঘশ্বাস পুঞ্জীভূত হতে হতে জমাট বেঁধে ক্রমে কঠোর সংকল্পে পরিণত হল।

কর্কটী ও ভীম। মাতা এবং পুত্র। ভীম বালকমাত্র। ভীম উতলা হয়—কে তার পিতা?

পর্বতের গাত্রে গাত্রে প্রতিধ্বনিত হয়ঃ—কে? কে? কে?

ভীম সংশয়ে কাতর হয়ঃ—শুধু মা আর সে। আর কেউ নয়। কেউ কি তার নেই?

ভীম কর্কটীকে শুধালোঃ—আমার পিতা কে? একা রয়েছি এই পর্বতে। কেউ কি কোথাও আমাদের নেই?

কর্কটী অন্যমনা হয়। ছবির পর ছবি। আসে, যায়। তার চোখের তারায় কত ছায়া, কত ছবি।

রাক্ষস কর্কট, রাক্ষসী পুষ্কসী। তাদেরই কন্যা কর্কটী। নিতান্তই সে আনাথা নয়। রাক্ষস বিরাধ। তারই পত্নী কর্কটী। কিন্তু বিধি বাম। সুখ সইল না। রামচন্দ্রের হাতে বিরাধ নিহত হল। স্বামীহারা কর্কটী চলে এল পিতার কাছে।

কিন্তু বিধি বাম। সামান্য সুখটুকুও সইল না। সামান্য ক'দিন। তারপরই এল সেই দিন। কর্কট এবং পুষ্কসী দু'জনেই পরিণত হল ভস্মে। মুনি সুতীক্ষ্ণ। তপস্যায় পরাক্রান্ত। কর্কট ও পুষ্কসীর লোলুপ হস্ত প্রসারিত হল সুতীক্ষ্ণ-র দিকে। তারপরই নেমে এল মহাশাস্তি। মুনির ক্রোধে

কর্কটী সম্পূর্ণ একা হয়ে পড়ল। স্বামী নেই, পিতা নেই, মাতা নেই। সহ্যপর্বতে সে চলে এল। পর্বত বুক পেতে তার দুঃখ গ্রহণ করল।

সহসা একদা আর এক দুঃখ এল। সঙ্গে কিছুটা শান্তিও।

বিখ্যাত রাবণ। বিখ্যাত তার ভাই কুম্ভকর্ণ। সেই পরাক্রান্ত কুম্ভকর্ণ এল সহ্যপর্বতে। কর্কটীকে গান্ধর্ববিবাহ করলো। জন্ম হল ভীমের। একজন এসেছিল। দগ্ধ করে গেল। কিন্তু রেখে গেল কিছু শান্তি। সন্তান এল বুকে। দুঃখ গেল দূরে।

কর্কটীর চোখে ছায়া. ছবি। কর্কটী বর্ণনা করল। ভীম বড় হয়েছে। সে মাতার দুঃখ বুঝল। কিন্তু—

কোথায় পিতা?

কর্কটী নতমুখে উত্তর দিল :—রামচন্দ্রের হাতে তাঁরও কাল হয়েছে।

পাষাণের বুকের উপর দাঁড়িয়ে ভীমও পাষাণ হল। একা সেই হরিই তাদের তাবৎ দুঃখের কারণ। মাতামহ নেই, বিরাধ নেই, কুম্ভকর্ণও নেই। কিন্তু ভীম আছে। এখনও সহ্যপর্বতের পাষাণবক্ষ তার পদপাতে কেঁপে উঠে। ভীম সংকল্পে কঠোর হল :—হরির অনিষ্ট চাই। যে করেই হোক সে তা করবে।

শক্তি চাই। হরিকে ক্লিষ্ট করতে হবে। অতএব শক্তি চাই। আর শক্তির জন্য চাই তপস্যা।

ভীম ব্রহ্মার তপস্যায় একাগ্র হল। ঊর্ধ্ববাহু হয়ে এক-পায়ে দাঁড়িয়ে সূর্যের দিকে তাকিয়ে ভীম ব্রহ্মার ধ্যান করতে লাগল। তপস্যায় তপস্যায় ভীমের মধ্যে উপজাত হ'ল অনন্ত তেজ। দেব-সমাজেও ছড়িয়ে পড়ল সেই তেজ। দেবতারা ছুটে এলেন। ব্রহ্মাকে বললেন :—তপস্যার তেজে সব পুড়তে বসেছে। এবার যা হয় একটা বর তাকে দিন।

ব্রহ্মা এলেন। হাঁসের পিঠ থেকে নেমে ভক্তসমীপে এসে মধুর স্বরে ব্রহ্মা বললেন :—কি চাও? আমি এসেছি। বর দেব।—নাও।

ভীম বলল :—এত যদি প্রসন্ন তাহলে অতুল বল দান করুন।

ব্রহ্মা ভক্তকে চরিতার্থ করে ফিরে এলেন।

ভীম এল মাতার কাছে। বলল :—আজ থেকেই দেবতাদের সঙ্গে আমার যুদ্ধ। একে একে দেখো কি ভাবে উৎসাদিত হয় দেবকুল।

নিকটেই কামরূপ। কামরূপই হ'ল ভীমের প্রথম শিকার। রাজা বন্দী হলেন।

রাজা পরম বৈষ্ণব। অহো বিধাতার ইচ্ছা কি নিদারুণ। সহসা শত্রু এল, সর্বস্ব জিতে নিল। এখন তিনি বন্দী। ভক্ত রাজা ঈশ্বরকে স্মরণ করলেন। নির্জন বন্দীশালায় মাটি দিয়ে শিব গড়লেন, পূজা করলেন।

মনে মনেই তিনি গঙ্গায় স্নান করলেন, গঙ্গার স্তব করলেন, আর পূজা করলেন শিবের। পূজা শেষে জপতে লাগলেন —নমঃ শিবায়। নমঃ শিবায়। নমঃ শিবায়। রাণী দক্ষিণা। তিনিও রাজাকে অনুসরণ করলেন। ওঁরা দুজনেই পূজায় অনন্যমনা হলেন।

ওদিকে ভীমের বিজয়-অভিযান অব্যাহতই রইল। সমগ্র পৃথিবীই ক্রমে তার পদানত হল। বেদ উপনিষদের কথা, আচার অনুষ্ঠান সব লোপ পেল। ঋষি ও দেবতারাও বাদ গেলেন না। তাঁদের জীবনেও দুঃখ নেমে এল।

ক্লিষ্ট দেব-সমাজ। ক্লিষ্ট ঋষি-সমাজ। মহাকোশী নদীর তীরে ওঁরা শঙ্করের শরণ নিলেন। পূজায় স্তবে শঙ্কর প্রসন্ন হলেন :—কি চাও বল।

দেবতারা বললেন :—সবই আপনি জানেন, তবু শুধিয়েছেন, বলছি। ভীমের পরাক্রমে আমরা নিয়ত ত্রাহি ত্রাহি করছি। আপনি অগতির গতি। রাক্ষসের হাত থেকে আমাদের উদ্ধার করুন।

শিব বললেন :—তোমাদের পীড়িত করেছে, আমার প্রিয় ভক্ত কামরূপেশ্বরকেও করেছে। কাজেই আমি যা হোক একটা কিছু অবিলম্বেই করছি।

শিব প্রমথদের নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

রাক্ষস ভীম অদ্য অত্যন্ত উত্তেজিত। অনুচরেরা এসে নিবেদন করল :—কামরূপেশ্বর মাটির শিব পুজো করছে। আপনার অভিচার করছে।

ভীম উত্তেজিত হল। এতদূর স্পর্ধাকে পরাক্রান্ত রাক্ষসের পক্ষে সহ্য করা কঠিন। ভীম তরবারি হাতে ছুটে গেল বন্দীশালায়।

মাটির শিব, নানাবিধ পূজার উপকরণ। ভীম ক্ষণকাল তাকিয়ে রইল। দাঁতে দাঁত ঘষল। গুঁড়িয়ে দিতে চাইল সমস্ত। কিন্তু রাজা এসব কি করছে। এ কি অভিচার? ভীম যেন কিছুটা ভীতও হল। জিজ্ঞেস করল :—কি করছ, কেনই বা করছ? সত্যি করে বল। ন'ইলে তোমার মৃত্যু অবধারিত।

রাজা মুহূর্তে মনকে দৃঢ় করে ফেললেন। যা হবার তা হবে। রাজা মরিয়া হয়ে সত্য কথাই বললেন। রাজা বললেন :—মাটির এই শিবলিঙ্গ নিছক মাটিরই নয়। এর মধ্যে আছেন শঙ্কর। তাঁর ভক্তকে কেউ পীড়ন করলে তিনি নেমে আসেন, বিহিত করেন। আমি নিতান্তই দীন হীন। তাই হয়ত তিনি এখনও মুখ ফিরিয়ে আছেন। আমি সেই শঙ্করেরই পূজা করছিলাম।

ভীম বলল :—ওহো শিব! তাকে আমি সম্যক জানি। আমারই জ্যাঠা রাবণ। নাম শুনেছ নিশ্চয়ই। শিবকে জ্যাঠামশাই নিতান্তই দাস বানিয়ে রেখেছিলেন। সেই শিবের কাছে তুমি বিহিত আশা কর!—হাসালে। যা হোক ডাকো তাকে। যত খুশি ডাকো। আসুক, বিহিত করুক। আমার সঙ্গে তার একবার দেখা হলেই সব বুঝবে। যতক্ষণ দেখা না হয় ততক্ষণ মনে মনে জয়ের

আশা পুষে তাকে ডাকো। যত পার ডাকো। কিন্তু এই শিবলিঙ্গ এখান থেকে দূর করবে, ন'ইলে আমার শরীরে যে কি বল তার কিঞ্চিৎ পরিচয় তোমাকে দিতে আমি বাধ্য হব।

আমি নিতান্তই হয়'ত অধম। ভয়ে তাঁকে দূরও হয়'ত করব। কিন্তু তিনি আমায় ত্যাগ করবেন না। ভক্তকে তিনি দেখেন।

ব্যাটা নিজে ভিক্ষে করে খায়। তাকে কে দেখে তারই নেই ঠিক। সে দেখবে ভক্তকে! একবার এলে তো হত। একটু যুদ্ধটুদ্ধ করার না হয় চেষ্টা করা যেত।

তোমার শক্তি আছে। আমিও আপাতত তোমার বন্দী। তুমি যা-খুশি করতে পার, বলতেও পার।

ভীম হঠাৎ রেগে গেল। বলল :—তোমার শিব নাকি ভক্তের ভগবান, দেখি কেমন তার বল।

করাল এক করবাল নিক্ষিপ্ত হ'ল রাজার প্রতি। পলকমধ্যে মাটির সেই লিঙ্গ থেকে শিব বেরিয়ে এলেন। বললেন : ভীমেশ্বর রূপে আমি আবির্ভূত হলাম। আমি ভক্তকে রাখি। এবং আমার সে ক্ষমতা প্রত্যক্ষ কর।

পিনাকের ঘায়ে সেই করবাল ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। এবার ত্রিশূল, তারপর শক্তি অস্ত্র। কিন্তু সমস্তই মিশে গেল ধূলোয়। ক্রমে ভীমের অস্ত্রশস্ত্র ফুরিয়ে এল। রাক্ষসবাহিনী এল এগিয়ে। প্রমথগণের সঙ্গে তাদের ঘোরতর যুদ্ধ শুরু হল! সমুদ্র, পর্বত, আকাশ, গ্রহ-নক্ষত্র চঞ্চল হ'ল। দেবতারা, ঋষিরাও চঞ্চল হলেন। পীড়া ছড়িয়ে পড়ল সর্বত্র।

নারদ এসে নিবেদন করলেন :—প্রভু সব যে যায়। এবার ঐ রাক্ষসকে বধ করুন।

সহসা যেন দাবানল ছড়িয়ে পড়ল। শিব হুঙ্কার দিলেন। পলকমধ্যে রাক্ষসগণ ভস্ম হল। ভীমের ভস্ম কোথায় যে পড়ল, কেউ নিরূপণই করতে পারল না। শিবের ক্রোধ শান্ত হল না। বনে বনে ছড়িয়ে পড়ল জ্বালা। রাক্ষসের ভস্মে ভস্মে সমস্ত বন পরিব্যাপ্ত। যেসব ওষধি কাজে আসত না কোন তাও ভস্মের প্রভাবে হ'ল কার্যকরী।

শিবের ক্রোধ ক্রমেই ছড়িয়ে পড়তে থাকল। দেবতারা এসে মিনতি করে বললেন :—প্রভু প্রশমিত হোন। এদেশে বহুতর দুঃখ, বহুতর জ্বালা। আপনি এস্থানে অবস্থান করুন, কল্যাণ বিতরণ করুন। এখানে আপনি আছেন, লোকে জানবে আছেন ভীমশঙ্কর।

ভক্তের ভগবান মুহূর্তে শান্ত হলেন। প্রসন্ন হাস্যে বিস্তার করলেন অযুত মহিমা। *

---

* এই কাহিনী শিবপুরাণ থেকে সংগৃহীত। ধর্মসংহিতা, অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়।

মজার ম্যাজিক

ফরাসী দেশে দেখানো আজব 'ভোজ' বাজী

যাদুকর এ. সি. সরকার

কথা হচ্ছিল খাদ্য বৈচিত্র্য নিয়ে। প্রসঙ্গটা অবশ্যি আমিই তুলেছিলাম ঘরের ভেতরে আমরা চারটি প্রাণী—আমি, শ্রীমতী গীতাঞ্জলি, জন ও হোটেলের ম্যানেজার রনো। বাইরে হু-হু করে বইছে শীতের হাওয়া। দরজা জানালা বন্ধ করে আগুনের পাশে বসে আমরা জমিয়ে তুলেছি আসর।

জন বলছিল এস্কিমোদের বিচিত্র আহার সামগ্রীর কথা। তাকে কথার মাঝখানে থামিয়ে দিয়ে রনো বললো—"যাই বল না কেন তুমি জন, পাখীর বাসা যে একটা উপাদেয় খাদ্য তা কি জানো তোমরা?"

তার কথা শেষ না হতেই জন বলে উঠলো, "রেখে দাও তোমাদের ফরাসীদের খাওয়া দাওয়ার কথা। তোমরা তো ব্যাঙের ঠ্যাং পেলে আর কিছুই চাও না।"

জনের কথায় উত্তেজিত হ'য়ে রনো কিছু বলতে যাচ্ছিল। যাতে একটা ঝগড়া আর কথা কাটাকাটির সৃষ্টি না হয়, সে জন্য প্রসঙ্গটাকে অন্য দিকে মোড় ফেরাবার জন্য গীতাঞ্জলি বলে উঠলো,—"যাদু-সম্রাট, আপনি একটা ম্যাজিক দেখান না। এ সব তর্কাতর্কির দরকার কি। আমাদের সময়টা একটু ভালভাবে কাটুক। বাইরে যা তুষারপাত শুরু হয়েছে তাতে তা ঘরের বাইরে বেরুনোই দায়। গত দশ বছরে ও বোধ হয় পারী সহরে আজকের মত এমন দুর্যোগ পড়েনি।"

গীতাঞ্জলির ইঙ্গিত বুঝতে কষ্ট হল না আমার। আমি ঐ বিচিত্র খাদ্য-প্রসঙ্গ দিয়েই শুরু করলাম। অদূরে চেস্ট অব ড্রয়ারের ওপরে বসানো ছিল একটা 'কাণ্ডেল স্ট্যাণ্ড' তার উপরে বসানো ছিল একটা মোটাসোটা মোমবাতি। ওদের দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট করে আমি বললাম—"অনেক বিচিত্র খাদ্য বস্তুর কথাই তো বললে তোমরা। মোমবাতিও যে একটা উপাদেয় খাদ্যদ্রব্য তা কি শুনেছ কোন দিন?"

কথা শেষ করে আমি উঠে দাঁড়ালাম। পকেট থেকে দেশলাই বের করে নিয়ে মোমবাতিটার পলতেতে আগুন ধরিয়ে দিলাম। মিট মিট করে জ্বলতে থাকলো মোমবাতি।

জ্বলন্ত মোমবাতিটাকে হাতে তুলে নিয়ে এগিয়ে এলাম ওদের দিকে। গিলি—গিলি—হোকাস পোকাস···মন্ত্র পড়ে জোরে ফুঁ দিলাম মোমবাতির উপরে। সেটা নিভে গেল। এর পরে মস্ত বড়

হাঁ করে মোমবাতিটাকে মুখের মধ্যে নিয়ে বিশেষ পরিতৃপ্তির সঙ্গে সেটা চিবিয়ে চিবিয়ে খেয়ে শেষ করলাম। কাণ্ড দেখে তো দর্শকেরা বিস্ময়ে হতবাক!

তোমরা ও খুব সহজে এ খেলাটা করতে পারবে। শুধু একটা নকল মোমবাতি বানিয়ে নেবার কাজটা ধৈর্য ধরে করতে পারলেই হল। এখন কথা হচ্ছে, নকল মোমবাতি বানাবে কেমন করে। আমি এ কাজটি করেছিলাম আপেল কেটে। বড় দেখে একটা আপেল নিয়ে সেটাকে ধারালো ছুরি দিয়ে কেটে ছেঁটে ঠিক একটা আধপোড়া মোমবাতির আকারের করে নিয়ে ছিলাম। এ ব্যাপারে গীতাঞ্জলি আমাকে খুব সাহায্য করেছিল। পলতের জায়গাটাতে বসিয়ে দিয়েছিলাম কাঠবাদামের একটা সরু ফালি। বাদামের ভেতরে যে তেল আছে তারই প্রভাবে এই অংশটা মিট মিট করে জ্বলে উঠেছিল। দর্শকেরা একটু দূরে থাকায় এ সব কিছু টের পায় নি। গীতাঞ্জলি তো সবই জানতো।

পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী আমরা খাদ্য প্রসঙ্গের অবতারণা করেছিলাম। আপেল আর বাদাম দুই-ই উপাদেয় খাদ্য কাজেই এ খেতে বাধা কোথায়? আপেল দিয়ে নকল মোমবাতি বানানো যদি তোমাদের পক্ষে সম্ভব না হয় তবে কলা ব্যবহার করে দেখতে পার। যাই ব্যবহার কর না কেন কাজটা যেন খুব নিখুঁত হয়।

দুপুরের ডাক

প্রীতিভূষণ চাকী

এক রতি প্রজাপতি
ওড়ে কত দূর।
জোনাকিটা ঘুম দেয়
সারাটা দুপুর ;

ফড়িংটা অকারণে
হেসে হয় খুন—
মৌমাছি কাজ সেরে
গায় গুন্ গুন্।

গুবরেটা জুল জুল
ছাখে ঘুঘুটাকে,
উড়ে গেলে চলে আসে
পিঁপড়ের ডাকে।

অঙ্কের খাতাটায়
দুপুরের পট,
খোকাকে যে ডাক দেয়
আয় চট্ পট্।

———

তুল তুল

ধীরেন করগুপ্ত

ছোট্ট পুতুল
তুল, তুল, তুল,
তুলোয় ছিল গড়া—

লাল টুক্ টুক্
রাঙ্গা মুখে
মিষ্টি হাসি ভরা।

খিল, খিল, খিল,
হাসতো খালি
ঢুল্, ঢুল্, ঢুল্, ঢুলে।

সন্ধ্যে বেলা
ঘুমিয়ে গেলে
দিতেম রেখে তুলে।

———

দণ্ডকারণ্যের একাংশে

শ্রীফাগুরাম সোরেণ (১৮৩৯৫)

(বয়স ১৪ বৎসর ১০ মাস)

[পার্থসারথি স্মৃতি-পুরস্কার প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত রচনা]

॥ এক ॥

পোঁপ—পোঁপ—পোঁ—ওঁ—ওঁ····· ।—হর্ণ দেয় বিণু ড্রাইভার।

জীপকারটা দাঁড়ালো—টাটানগর, সাকচির বড় বিল্ডিংটার সামনে। গাড়ীতে নীরুবাবু অর্থাৎ নিরদ বরণ মুখোপাধ্যায়। বেরিয়েছেন এদেশের দণ্ডকারণ্য ভ্রমণে। সঙ্গে নিয়ে যাবেন ধীরেন বাবুকে।

সব তৈরী—বেরুচ্ছি, মাত্র পাঁচ মিনিট। —ঘর থেকে সাড়াদেন আমাদের ধীরুবাবু অর্থাৎ ধীরেন্দ্রনাথ সরকার। তাড়াতাড়ি আরদালি ঝগড়ু সিংকে নিয়ে এসে—জীপারোহণ করলেন। আমিও বাদ পড়লাম না।

৪ঠা মে, বুধবার। বৈকাল সাড়ে তিনটা।

সোঁ-সোঁ করে ছুটে চলে জীপকারটা, চল্লিশ মাইল স্পীডে রাস্তায় একটা সহর। ঠিক সাড়ে চারটা। থামলো গাড়ীটা পাকাবাড়ীটার সামনে। সবার চক্ষু আকর্ষিত হয় ওই বোর্ডটার দিকে। সুন্দর বড় বড় অক্ষর—"সদর বনবিভাগের দপ্তর—সিংহভূম, চাইবাসা"

গুট গুট করে দপ্তরে ঢুকে পড়লেন আমাদের ধীরুবাবু আর নীরুবাবু। আধঘণ্টা লাগলো তাঁদের ফিরতে। হাতে দু' টুকরো কাগজ—'বনবিভাগের রোড পারমিট' আর 'রেস্ট হাউসে থাকবার অনুমতি পত্র'।

ভুর্-র্·····গন্-গন্-গন্ গন্ । —আবার ছুটলো গাড়ীটা।

চাইবাসাকে বাইশ মাইল পিছনে রেখে পেলাম—হাটগামারিয়া। একটু এগিয়েই পিচ রোডটাকে ডাইনে রেখে বাঁয়ে মোড় খায় গাড়ীটা। মাইল মিটার কুড়ির দাগে দাঁড়ায়।

কাঁচা রাস্তা। ঢলে ঢলে চলে গাড়ী। কখনো বা আচমকা ঝটকা। খ্যাঁচ করে লাগে কোমরে ব্যথা। তবু থামে না গাড়ীটা। এমনি ভাবে কুড়ি মাইল অতিক্রম করার পর নজর পড়ে হাত ঘড়িটার দিকে। কাঁটা সাড়ে ছয়ের দাগে। কবেই সূর্যদেব পাটে নেমেছেন—কারো খেয়াল নেই। সামনেই একটা পাহাড়ের সারি—পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে। নীচে একটা গ্রাম—বরাইবুরু।

তাইত !—গম্ভীর হয়ে বলেন নীরুবাবু। এত দেরী হয়ে যাবে বোঝা যায়নি। অন্ধকার জমাট বেঁধে আসছে! আরও সাতাশ মাইল, তবে—সলাই বাংলো। সেখানে গিয়ে হল্টিংএর কথা। এই রাতে পাহাড় পথে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। পথের ওপর পড়ে চেক্‌পোস্ট। সন্ধ্যাবেলাতেই গেট বন্ধ হয়ে যায়। ফরেস্ট রোড—বাংলোর পারমিট থাকলেও, বনের মধ্যে ঢুকতে দেবে না।

তবে—কি হবে উপায় ?

পাহাড়ের ওপর ওই একটা বাড়ী না? নিশ্চয় বরাইবুরু ফরেস্ট বাংলো। নামা যাক ওখানে।

গাড়ী দাঁড়ালো। ফরেস্ট অফিসার মহোদয় বাংলোতে বসে কি যেন লিখছেন। একটা গুড ইভ্‌নিং জানালেন নীরুবাবু। তার প্রতিধ্বনিটাও আসলো অফিসারের দিক থেকে। দেরী হলো না অবশ্য—স্পেশাল গেট পাশটা শীঘ্রই মিলে গেল। চটপট আবার সেখান থেকে আগে বাড়লাম।

পোঁপ—পোঁপ—পোঁ—ওঁ—ওঁ··· ।—খানিক এগিয়েই গর্জে ওঠে জীপটা। রাস্তা বন্ধ। এটা একটা নাকা। ভাগ্যি সইকরা স্পেশাল অর্ডার ছিল। গাড়ীর হর্ণ শুনে বেরিয়ে আসে চৌকিদার। গেটটা খুলে দেয়। নীরুবাবু আগেও একবার এদিকে এসেছিলেন। তাই, এ সবের ব্যাপার তিনি কিছু কিছু জানেন।

গাড়ী চলেছে—পাহাড়ের পথে, পাহাড়ের উপর ঘুরে ঘুরে। পথের চারদিকে বড় বড় গাছ। আঁকাবাঁকা সড়ক পাহাড়ের বেশ উপর দিকেই তুলতে থাকে। এ পথে গাড়ী বিশেষ চলে বলে মনেই হয় না।

ঝন ঝন শব্দ তুলে গাড়ী এগিয়েই চলেছে। কিছু দূর গিয়ে পথের একটা বাঁক ঘুরতেই হঠাৎ চোখে পড়ে—একটা আলো। জ্যোৎস্নার আলোতে দেখা যায়—পাহাড়ের কোলে খানিকটা খোলা মাঠে বড় বেড়া দিয়ে ঘেরা—কাঠের কয়েকটা ছাউনি। তারই ফাঁকে মিট মিট করে আলো জ্বলে।

পোঁপ—পোঁপ—পোঁ—ওঁ—ওঁ ।—আবার হর্ণ দেয় বিণু ড্রাইভার। বেরিয়ে পড়ে একটা নেপালী দারোয়ান। জিজ্ঞাসা করে বুঝি—আমরা ভুল পথ ধরেছি। 'কুমডির' রাস্তায় না গিয়ে—একেবারে চলে এসেছি মিশরিলালের খাদানে। এখানে তাঁর জমা নেওয়া গাছ কেটে রাখা হয়। এই কাঠ নিয়ে যেতে কখনো কখনো তাঁর ট্রাক এ পথে আসে।

ভালভাবে পথের আবার সন্ধানাদি নিয়ে গাড়ীর মুখ ফেরানো হলো।

এবার ঠিক পথ ধরে গাড়ী এগিয়ে চলে। ডাইনে খাড়া পাহাড় উপর দিকে ওঠে। বাঁয়ে ঢালু গা নীচে নামে। মাঝে মাঝে দু'দিকেই গাছের সারি। যেন, অন্ধকার সুড়ঙ্গ পথ। আবার কোথাও গাছ সরে গিয়ে সমতল ভূমির ওপর দেখায় জোনাকীর মত কতকগুলো আলো বিন্দু। মনে হয়—সেগুলো উড়িষ্যার বড়বিল খনির,—উড়িষ্যা গভর্ণমেণ্টের আয়রণ ও ম্যাঙ্গানিজ মাইন্স।

আবার—আবার সেই উভয় পার্শ্বে গাছের সারি,—মাথার উপরও গাছের ডালপালা। আলো ফেলে গাড়ী ছোটে। নিস্তব্ধ বনের শান্তি ভাঙে। এঁকেবেঁকে ঘুরে সামনের পথ যেন এগিয়ে আসে। আশপাশের কালো কালো পাথরগুলো অন্ধকারে দেখতে কী বীভৎস—যেন সব বিকট দানবদল!

আবার ও কি? গাছের ছায়ায়—হাতি! কালো শরীর, কানও নাড়ে। রেস্ দেয় বিণু। ফক্ করে গাড়ী পার হয়ে যায়।

অবাক হই—কোথায় হাতি? কালো পাথর ও গাছের ডালপালায় এমনি করেই বোকা বানায়।

সবাই হেসে উঠি।

এই ভাবেই বাকি পথটুকুও কাটে। মনের আশা মনেই থাকে। রাতের আঁধার, চাঁদের আলো, বনের ছায়া, পাহাড়ের মসীকালো অঙ্গে মায়া-মরীচিকার নানান্ লীলা দেখায়।

বরাইবুরুর পাহাড়—কিরিবুরুর আয়রণ মাইন্স সব পিছনে ফেলে রাখি। পথ নামতে থাকে। পাহাড়ের তলায় দেখা যায় খোলা মাঠ। ছোট গ্রাম। চারদিকে মাড়ুয়ার ক্ষেত। ক্ষেতের চারপাশে ময়ূরের কর্কশ কেকাধ্বনি। সলাই বাংলো আর বেশী দূরে নয়। ছুটে চলেছে গাড়ী। রাস্তার সাইনপোস্টের সামনে বাঁকটা ঘুরেই সলাই বাংলোতে পৌঁছুই। তখন রাত দশটা।

পোঁ—পোঁ—পোঁ—পোঁ—পোঁপ্—পোঁপ্—পোঁপ্··· ।—হর্ণ বাজায় বিণু।

চৌকিদার!—চৌকিদার!—জোরে ডাক দেয় ঝগড়ু সিং।

না,—কারু সাড়াশব্দ নেই। দরজায় তালা লাগানো। একটু দূরে ছোট্ট একটা বাড়ী। ওইখান থেকে চৌকিদারকে ডেকে নিয়ে আসে আরদালি ঝগড়ু সিং আর বিণু ড্রাইভার।

চৌকিদার এসে দাঁড়ায় একটু তফাতে– বিনয়ে মাথা নত। তাকে দিয়ে কোন মতে দরজা খোলানো হয়। পাশেই রান্না ঘর। জল ও কাঠের ব্যবস্থা করা হলো। চাল, ডাল দিয়ে খিচুড়ি পাকায় ঝগড়ু সিং আর মদত করে বিণু ড্রাইভার।

আলুর দম আর বেগুনের চোখা দিয়ে পরিতৃপ্তির সঙ্গে আহার সাঙ্গ করে আরামে শয্যাগ্রহণ করা হলো। বিছানায় লম্বা হতেই দেরী—সঙ্গে সঙ্গেই বাবুদের ওপাশ থেকে শব্দ ভেসে আসলো—যেন বাঘের গর্জন। তার পরেই একটানা শব্দে রাত কাবার।

॥ দুই ॥

৫ই মে, বৃহস্পতিবার। প্রাতঃকাল।

বারান্দায় বেরিয়ে দেখি,—বাংলোর সামনে সুন্দর বাগান। টক্‌টকে লাল, হলদে, সবুজ, গোলাপী, বেগুনে নানা রঙের সদ্য ফোটা ফুল। দেখে চোখ জুড়ায়, মনে আনন্দ হয়।

সামনে অদূরে পাহাড় শ্রেণী। দূরেও চারিদিকে পাহাড়। বাংলোর পিছন দিকে পূর্ব ও উত্তর দিক ঘুরে বয়ে চলে 'কইনা' নদী। পশ্চিমে 'সোকরা কোচা' নালা। দু পাশে ঝোপ ঝাপ। উত্তরে রাস্তা—নদী পার হয়ে অপর পারে যায়। বোর্ডে লেখা—পাটুং আট মাইল।

তারপর পেট ভরে ব্রেক্‌ফাস্ট খেয়ে সবাই বসে পড়লাম জীপ-এ।

ঘুর্-র্……গন্-গন্-গন্-গন্-গোঁ……।—ছুটলো গাড়ীটা চিড়িয়ার দিকে ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে। বিরাট এক একটা পাহাড়।

আশ্চর্য হই—এ আমরা কোথায়?

সারাণ্ডায়।—ধীরুবাবুকে বুঝিয়ে বলেন নীরুবাবু। ভারতবর্ষের কটি দেশ ঘিরে এই একটা বিশাল বন—উড়িষ্যা থেকে শুরু করে বিহার, মধ্যপ্রদেশ হয়ে পশ্চিমে চলে গেছে। এইটাকেই আমি সবার সামনে বলি দণ্ডকারণ্যের একটা অংশ। কি হে, কথাটা বিশেষ অত্যুক্তি নয় তো?

স্বীকার না করে থাকতে পারে না কেউ।

বিহারে এই জঙ্গলটা চার ডিভিসনে ভাগ করা,—(১) সারাণ্ডা ডিভিসন, (২) পোড়াহাট-ডিভিসন, (৩) কোলহান ডিভিসন আর (৪) চাইবাসা ডিভিসন। এ সবই সিংভূমে।

অবাক কিন্তু– সারাণ্ডার বনে কাটা একটা শালগাছ মেপে দেখলেন ধীরুবাবু—লম্বায় আড়াই

শো ফুট আর পরিধিতে পনেরো ফুট হলো। শুধু শালই নয়—আসান, সেগুণ, কারাম, বিজা অর্থাৎ পিয়াশাল, আম, জাম, কাঁঠাল, মহুয়া, নিম, কাপাস, কেরাঞ্জি, লোলা, কুসুম ইত্যাদি গাছও এ জঙ্গলে পর্যাপ্ত। তাছাড়া এক প্রকার ঘাসও এ অঞ্চলে হয়—'সবাই'। পাকিয়ে দড়ি তৈরী করে,—খুব মজবুত। আর নীচে ঘন ঝোপঝাপ। তারই মধ্যে দিয়ে বয়ে আসে জলের নালা। পাহাড়ী ঝর্ণা। বালির উপর ক্ষীণ ধারা। চারদিকে ছড়ানো পাথর বোলডারস্—যেন বিরাট আকার কচ্ছপের দল। তারই কাছে কিছু জমা জল,—গাঢ় সবুজ রঙ। এই সব জায়গায় হাতি ও বাঘের অভাব নেই।

চিড়িয়ায় বার্ণপুরের ইণ্ডিয়ান আয়রণ অ্যাণ্ড স্টিল কোম্পানীর লোহার খনি। রেলের ছোট ছোট ওয়াগণে ভরে মনোহর পুরে নিয়ে যায়। সেখানে বড় ট্রেনে তোলে।

বাইরে তাকাই—ঘন কালো চুলের মাঝখানে সিঁথি কাটার মত পথের বাঁ দিক থেকে এসে ডাইনে পাহাড়ের ঢালু গায়ে সোজা লাইন গড়িয়ে নেমেছে—দু'দিকের জঙ্গল ভেদ করে। এরপর চিড়িয়া পৌঁছুই। সলাই বাংলো থেকে মাত্র ছয় মাইল।

চিড়িয়ার চারদিকে ছোট ছোট পাহাড়ে ঘেরা খানিকটা সমতল ভূমি। এক দিকের পাহাড় কিছু উঁচু। সেইখানে খনি। পাহাড়ের কোলে ছোট নদী। অনেকগুলো বাড়ীঘর ছাউনি। এখানে ওখানে ছড়ানো। তিন চারটি টিলার উপর সুন্দর বাংলো। বাগান। মাইন্স-এর কর্তৃবর্গ, কর্মচারী, কুলিমজুর থাকবার বিভিন্ন ব্যবস্থা। আবার সরকারী দপ্তরও আছে। গভীর জঙ্গলের মধ্যে তাই স্থানটি বড়ই সুন্দর দেখায়। কোলাহল মুখরও। যেন, শান্তবনে হঠাৎ-ওঠা সহর জীবনের দমকা হাওয়া।

মধ্যাহ্ন ভোজনের পর আবার বেরিয়ে পড়লাম। একটা খাস বাংলোর চত্বরে হঠাৎ সমারোহ। মুণিসমাজ কী জয়, সত্যজ্ঞান কী জয়, স্বতন্ত্র বিচার কী জয়, আত্মজ্ঞান কী জয়, যোগিরাজ রাজপতি জী কী জয়, সদগুরুদেব জী কী জয় আদিশব্দ লাউড্ স্পীকার শুনিয়ে দেয়। কাছে গেলাম। মুণিসমাজের বিরাট অধিবেশন। এখানকার আদিবাসী—হরিজন, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান সবাই জাতিভেদ ভুলে গিয়ে মুণিসমাজ নামে কি একটা বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠান মেনে নিয়েছে। গোরখপুর থেকে তাদের প্রধান শিক্ষাদাতা মুণিশিরোমণি যোগিরাজ রাজপতি মুণি জী মহারাজ এসে যোগ, স্বাস্থ্য ও আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে অকাট্য পূর্ণ অজস্র হিন্দী ও ইংরেজীতে ভাষণ দিচ্ছিলেন। অসংখ্য কুলিমজুর, বাবু সাহেব, মালিক, ম্যানেজার সবাই মন্ত্রমুগ্ধবত স্থিরাসনে বসে একান্ত মনে তাঁর ভাষণ শুনছিলেন। হঠাৎ একজন ভদ্রলোক এসে আমাদের ডেকে নিয়ে উপযুক্ত আসনে বসিয়ে দিলেন। আমরাও তাঁর ভাষণ শুনে নিজেকে ধন্য মনে করলাম।

বাস্তবিকপক্ষে মুণিসমাজের জ্ঞান মনুষ্যকে উঠিয়ে নিয়ে যেতে পারে মনুষ্যত্বের উচ্চস্তরে। মনে

হয়, এই সমাজ প্রগতিশীল হতে পারলে—মানুষ সত্যজ্ঞান, সত্য শান্তি, সত্য সুখ, সত্য স্বরাজ, স্বাস্থ্য, অমরত্ব অনায়াসেই পেয়ে যাবে—সন্দেহ নাই।

সভা ভঙ্গ হলো। সত্য জ্ঞানের প্রশংসা করতে করতে আমরাও উঠে পড়লাম। মনে হলো—এটা আগেকার মুণি-ঋষিদের নিশ্চয়ই তপঃভূমি ছিল।

এই সুযোগে আমার প্রিয় বন্ধু লেবার কন্ট্রাক্টার দয়ানিধি দাস বাবুর সঙ্গে হঠাৎ দেখা। তিনিও নাকি মুণিসমাজের একজন প্রমুখ সদস্য। আগ্রহের সহিত আমাদের সবাইকে নিয়ে যান টি-পার্টিতে। কেউ বা এই জঙ্গলেও ভালো চা, বিস্কুট খাওয়ান। চাকরির দায়ে বনে থাকা,—হঠাৎ আসা আগন্তুকদের পেয়ে বাইরের জগতের ক্ষণিক আনন্দের স্বাদ উপভোগ করেন। যেন, রুদ্ধ ঘরের হঠাৎ জানালা খোলা।

এখানে আবার হাটও বসে। নদীর ধারে ময়দানে দোকান-পাট। ঝুড়ি মাথায়, বাঁক কাঁধে আদিবাসী হেটেলরা আসে। সহর থেকে আনা সস্তা শৌখিন জিনিষও বিক্রী হয় মনিহারী দোকানে। তারা বাইরে থেকে আসা ব্যবসাদার। কাঁচের চুড়ি, পুঁতির মালার চাহিদা খুব। আদিবাসী মেয়েরা সেখানে ভিড় জমায়,—গহনা বাছে, খিল খিল করে হেসে ওঠে। ছেলে পুরুষ চা ও পান-বিড়ির দোকানে জটলা পাকায়। আমাদেরও গরম গরম ফুলুরি ও জিলিপীর সেইখানে বসেই সানন্দে সদ্ব্যবহার চলে।

এখানেও দেখি সহরের মতন সর্বভারতীয় সমাবেশ। ডাক্তার বাঙ্গালী। রেলওয়ে অফিসার—ফিরিঙ্গী। মাদ্রাজী—একাউন্টস্ অফিসার। বম্বেবাসী—ম্যানেজার। লেবার অফিসার—বিহারী। মনে পড়ে 'পথের দাবীর' সেই সব ভারতীয় জামাতাগোষ্ঠী।

সন্ধ্যা হয়-হয়। সলাই বাংলোতে ফিরে এলাম।

॥ তিন ॥

৬ই মে, শুক্রবার। প্রাতঃকাল।

সলাই বাংলো থেকে বিদায় নিলাম। গাড়ী চললো পাটং-এর রাস্তা দিয়ে। ছোটানাগরা হয়ে পঁচিশ মাইল পথ অতিক্রম করার পর থাল্‌কোবাদে পৌঁছুই। রাস্তায় ফেলে এলাম গভীর বন। ঘুরে ঘুরে পাহাড়ে ওঠা পথ। কখন বা হঠাৎ খানিক সমতল ভূমি।

ছোটানাগরায় ছড়ানো ঘরবাড়ী। বড় বড় মোটা কাঠের বেড়া দিয়ে ঘেরা সব বাড়ীর এলাকা। কোথাও নোঙরা নেই—ছবির মত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গ্রাম। ঘরের দেওয়ালে কত রকম রেখাচিত্র। মেয়েদের নিজ হাতে অঙ্কিত জীব-জন্তুর ছবি; কোথাও বা সাদা, কালো, লাল রং করা।

ছোটানাগরার নিকটে জঙ্গলের ধারে একটা ছোট মন্দির। তার মধ্যে হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি—গনেশ, কার্তিক, শিব ও পার্বতী। এখানকার আদিবাসীরা যে হিন্দুধর্মই মানে তার জাজ্বল্য প্রমাণ। এখনও ইহাদের অনেকেই মুণিসমাজের অন্তর্গত সনাতন ধর্মাবলম্বী।

এ দেশের দণ্ডকারণ্যে বিশাল বন বলতে আমরা খাল্‌কোবাদের পথেই পেয়েছি। এই জঙ্গলই বিশেষ করে সারাণ্ডার গৌরব।

একটা ছোট নদী পার হয়ে পাহাড়ের চড়াই ঘুরে ঘুরে অনেকখানি উঠে খাল্‌কোবাদে আসা যায়। দুপুরবেলা এইখানেই ভোজন ও বিশ্রাম হয়। প্রশস্ত মালভূমি। পাহাড়ের হাজার চারেক ফুট উঁচুতে। হিমালয়ের তুলনায় কিছুই নয়, কিন্তু সাজানো গোছানো প্রকাণ্ড বাংলোটা যেন অরণ্য-রাজ্যের গিরিরাজ। সলাই বাংলোর চেয়ে খুব বড়। সুন্দর বাগান। মাঝে মাঝে বসবার জায়গা। এককালে বড় বড় সাহেবরা—লাটসাহেবও আসতেন এখানে বিহার, বিশ্রাম ও শিকারের জন্য।

বাগানের একপাশে খাড়া গ্যালারির উপর অংশে সুটিং প্ল্যাটফর্ম। এখানে বসে বীর শিকারীরা বাঘ মারতেন। পাহাড়ের গায়ে হাত পঁচিশ ত্রিশ নীচে বাঁধানো বারান্দার মত খোলা সমতল ভূমি,—ফুটবল খেলার মাঠ যেন। এই মাঠে এখনও রাতে বন্যজন্তু দেখা যায়। দেরাদুন ফরেস্ট ইন্‌ষ্টিটিউটের ছাত্ররা প্রতি বছর এখানে ট্রেনিং-এ আসে—গাছপালার সঙ্গে পরিচয় করতে।

সেই জঙ্গলেরই ধার দিয়ে খানিকটা জীপে করে, বাকিটা হেঁটে পাহাড়ের অনেকখানি উপরে উঠি। প্রায় মাথার কাছাকাছি। বাংলো থেকে মাইল তিনেক দূর। Lyall's View Point সারাণ্ডার সবচেয়ে সুন্দর দৃশ্য। চার হাজার ফুট-এরও অধিক উঁচু পাহাড়ের মাথা থেকে বহু নীচে দেখা যায়,—সামনে, দক্ষিণে, বামে যতদূর দৃষ্টি চলে ঘন সবুজ তরঙ্গের খেলা। যেন, পটে আঁকা নিশ্চল, নিষ্কম্প দিগন্ত বিস্তৃত পাহাড়ের পর পাহাড়ের সারি। বিরাট নিঃশব্দতা। সুগভীর প্রশান্তি। স্থির হয়ে বসে দেখতে মনপ্রাণ সেই অসীমতায় হারিয়ে যায়।

নীরুবাবু বলেন—সামনে ওই দিকের জঙ্গল উড়িষ্যাতে,—মাত্র মাইল ছয় এখান থেকে। প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরে উড়িষ্যার বোনাইগড়ের বনও নাকি দেখা যায়।

সারাণ্ডা অঞ্চলের মেয়ে পুরুষদের গায়ের রঙ নিকষ কালো। যেন, কালো পাথর কেটে খোদাই করা চকচকে দেহ; অত্যন্ত নিটোল স্বাস্থ্য। মাথায় কোঁকড়ানো ঝাঁকড়া চুল। কারও কারও গায়ে হাতকাটা সার্ট, পরণে হাফ প্যান্ট। মনে হয়—কেউ খনিতে চাকরি করে আর কেউ বা বনবিভাগে।

সকলেই আদিবাসী। ক্বচিৎ দু'একটা সাঁওতাল আর বাকি সব 'হো' জাতি। তাদের ভাষার নামও 'হো'। 'হো' মানে মানুষ। পৃথিবীর বহু স্থানেই আদিবাসীরা আপন ভাষায় নিজেদের 'মানুষ'

নামে পরিচয় দেয়। এদের ধারণায় জগত তিন ভাগে ভাগ করা,—(১) উদ্ভিদ জগত, (২) প্রাণী জগত আর (৩) মনুষ্য জগত। পাহাড়, বনজঙ্গলের ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে এদের সারা জীবন কাটে। তার বাইরে আর যেন অন্য জগত নেই। তাই বাইরের মানুষেরা 'হো' নয়—'দিকু' অর্থাৎ বিদেশী বা ভিন্ন আর এক জাতি।

কিন্তু সেই দুই জগতের মধ্যে বেড়া প্রায় ভেঙ্গে আসে। তাই হো-দেরও গায়ে জামা ওঠে, চুলও ছোট হয়। মেয়েদের গায়ে মোটা কাপড়ের বদলে মিহি সুতীর শাড়ী, কভু শায়া, জাকিট। মাথায় ঘোমটা দেওয়া তাদের অভ্যাস নেই কিন্তু খোঁপায় লাল জবাফুল, কারও বা হলদে গাঁদা অথবা করবী কিম্বা গুলঞ্চ নতুবা গাছের ছোট্ট কোমল শাখা গুঁজে নেয়। সর্বদা মেয়েদের মুখে খিল্ খিল্ হাসির ধ্বনি, যেন—পাহাড়ী ঝরণা অবিরাম বয়ে চলে। তাদের কাজ করতেও গান,—পথ চলতেও গান। দল বেঁধে যখন আসে—সারি বেঁধে পরস্পরের কোমর ধরে, দেহ দুলিয়ে, কণ্ঠ মিলিয়ে একটানা একই সুরে গান গায়, তখন যেন এক জীবন্ত ছবি। প্রাণময়, উচ্ছ্বাসময় সুর শুনে মন উদাস হয়। মনে হয় —পাহাড়, বন, বিশ্বপ্রকৃতি সজীব হয়ে নৃত্যচ্ছন্দে সঙ্গীত ধরে। নদীতেও যখন তারা আসে, তখন হাসে, গাগরী ভরে জল তোলে আর গান গেয়ে ফিরে চলে।

অনেকেই এদের অশিক্ষিত বর্বর ভাবে। কিন্তু সেই ছেলেবেলা থেকে দেখছি, এদের পাড়ায় বাস করছি, তাদের নিয়ে কাজ করছি, সাথে পড়ছি, সঙ্গেও মিশছি,—কত সদ্‌গুণে এদের দেখলে শ্রদ্ধা হয়। এদের ঘর-দোর যেমনি পরিষ্কার, স্বভাব-চরিত্রও তেমনি নির্মল আর ব্যবহারও কত সরল। সাধারণ লোকের ধারণা এদের দুশ্চরিত্র (Loose morals)। এটা কিন্তু ভুল। চরিত্রবল এদের অতি দৃঢ় (Strict morality)। এমনি দেখতে ভাল মানুষ, আচরণেও নিরীহ। কিন্তু দুশ্চরিত্রতা ঘটলে প্রাণ নিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। অথচ এদের ছেলে মেয়েদের মধ্যে অবাধ মিলন, একসঙ্গে হাসি-ঠাট্টা, নাচ-গান,—তবু অপ্রীতিকর ব্যাপার কিছু ঘটে না।

বার্তা বিনিময় করতে করতে বৈকাল সাড়ে তিনটা।

নীরুবাবু বললেন—এবার টাটানগরের পথ ধরা যাক।

গন্ গন্ শব্দে ছুটলো গাড়ী খাল্‌কোবাদ থেকে। ষোল মাইল অতিক্রম করার পর গোয়েলকেরা পৌঁছুই। এদিকের পথে পড়ে পাহাড় বামিয়াবুরু আর নদী—'কারো'। সেখানেও সুন্দর দৃশ্য। অঞ্চলের পাহাড়গুলির নাম বেশ—'বরাইবুরু', 'মারাংবুরু', 'বামিয়াবুরু', 'কিরিবুরু'—সবারই নামের শেষে 'বুরু'। 'বুরু' মানে পাহাড়। ডাকবাংলোও চমৎকার জায়গায় করা। বরাইবুরু, খাল্‌কোবাদ, সলাই তো দেখলামই এছাড়া পাটুং, আনকুয়া, ছোটানাগরা, কারোভ্যিউ আর গোয়েলকেরা উল্লেখ যোগ্য।

গোয়েলকেরা থেকে চক্রধরপুর, চাইবাসা হয়ে গাড়ী ছুটেই চলেছে। এদেশের দণ্ডকারণ্যের

একাংশে ভ্রমণের কাল সমাপ্ত হলো কিন্তু অন্তরের আনন্দ এখনও অন্তরে বিজ বিজ করছে, কবে শেষ হয় বলা অসম্ভব।

রাত্তির সাতটার সময় টাটানগর, সাকৃচিতে পৌঁছুই। আগেকার মত ওই বড় বিল্ডিংটার সামনেই জীপকারটা দাঁড়ালো। সবাই নেমে ধীরুবাবুর কোয়ার্টারে বসে। চা-সিগারেট হলো। তারপর নীরুবাবু বিণুর সাথে জীপ নিয়ে তাঁদের বাসায় গেলেন।

আমরাও সবাই ভোজনান্তে আপন আপন শয্যায় নাক ডাকা শুরু করলাম। বুঝতে পারলাম না কোন ফাঁকেই রাত কাবার।

৭ই মে শনিবার সকালে লিখতে বসলাম—অরণ্য ভ্রমণের নোট। লিখে শেষ করেছি—শুনলাম আজকেই আমার এক সহপাঠি কৃষ্ণ মজুমদার নেই—মারা পড়লো। খুব দুঃখিত হয়ে এই লেখাটি তার 'শ্রদ্ধাঞ্জলি'রূপে অর্পণ করলাম।

আজ "শিশুসাথী", অগ্রহায়ণ ১৩৭৫ অঙ্ক হঠাৎ সেই দিনটাকে আবার স্মরণ করিয়ে দেয়—

পার্থসারথি স্মৃতি পুরস্কার

রচনা প্রতিযোগিতা

১৯৬৬ সালের ৭ই মে আমাদের প্রিয় গ্রাহক পার্থসারথি সেনগুপ্ত দেহ ত্যাগ করে।.....তার শোক-সন্তপ্ত পিতা-মাতা প্রতি বছরের মতো এবারও একটি স্মৃতি-পুরস্কারের ব্যবস্থা করেছেন।... প্রতিযোগিতার বিষয় হল—যে কোনও একটি ভ্রমণ-কাহিনী।...২০শে ডিসেম্বরের মধ্যে শিশুসাথী অফিসে পৌঁছান দরকার।.....।

আশ্চর্য হই—একই দিনের একই ঘটনা। তাই কালবিলম্ব না করে আমার শিশুসাথার গ্রাহক ভাই পার্থসারথি সেনগুপ্তের অকাল মৃতুর স্মৃত্যার্থে সেই "দণ্ডকারণ্যের একাংশে" শীর্ষক রচনাটা শ্রদ্ধাঞ্জলি রূপে অর্পণ করলাম। তার স্বর্গবাস শান্তির হোক।

শুষ্ক শাখা

শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায় (গ্রাঃ নং—১৬০৯৮)

বেদনহতা, অনাদৃতা, সর্বহারা শুষ্ক শাখা,
জরার ভারে জীর্ণ তনু, রিক্ত হৃদয় বিষাদ মাখা।
মৌলভী সব মৌমাছি দল ভুলেছে আজ তোমার কথা
তোমার কাছে আসার তরে নেইকো অলির ব্যাকুলতা।
বসন্তেরই আগমণে আজকে মাতাল হলো ধরা—
স্তব্ধ যে আজ উত্তরী বায়, যায় চলে শীত পত্রঝরা।
দিগন্তে আজ নবীন প্রাতে, নতুন উষার সুর যে ঢালা
এমন ক্ষণে সাজাবে না, তোমার ফুলের বরণ ডালা।

এমনি আর এক বসন্তেরই নবীন প্রাতে শুষ্কশাখা
মনে পড়ে, যখন তুমি ছিলে সবুজ পত্রে ঢাকা—
তাজাতরুণ অঙ্গ তব পুষ্পভারে ছিল নত,
ব্যাকুল হয়ে এসেছিলো মৌ-পিয়াসী ভ্রমর যতো।
সুখের সেদিন কালের রথের চাকার তলে পড়লো ঢাক
ফুল বাগিচায় তইতো তুমি অনাদৃতা শুষ্কশাখা!

জেনে রেখো এটাই হলো এই জীবনের ইতিকথা
সুখের পরে দুঃখ আসে, আরাম শেষে পাবেই ব্যথা।
তোমার সুখের ক্ষণ ফুরালে এলো নিঠুর দুখের রাতি
দুঃসময়ে ভুললো তোমায় সুখের ক্ষণের যতেক সাথি।
তোমার মাঝে ফোটেনি ফুল পূর্ণ সেথায় জীর্ণ জরা
বসন্ত তাই ভুললো তোমায় ভুললো যত মধু হরা।

কিন্তু ওগো শুষ্ক শাখা, আজকে আরও জেনে রাখো
সবাই যদি ভোলেও তবু, কবি তেমোয় ভুলবে নাকো।
জরায় মরা ছবি তোমার যখনই তার পড়বে মনে
দেখা দেবে এক ফোঁটা জল, জেনো তাহার চোখের কোণে

শ্রীপ্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

অতল জলের আহ্বান

মনে কর, সমুদ্রের ৪ হাজার ফুট বা তারও বেশী নীচে একটি ছোট্ট শহর, আর সেই শহরের একটি ছোট্ট সুন্দর কুটিরে তুমি গেছ ছুটিতে বেড়াতে। কেমন লাগে বলতো? কথাটা তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না, তাই না? তুমি ভাবছো, তা আবার হয় নাকি? সমুদ্রের অত নীচে শহর থাকবে কেমন করে? যা বলছি তা একেবারে আজগুবি মনে কোরো না। সে দিন আর খুব বেশী দেরী নেই, যখন আমরা এই নতুন দেশে বেড়াতে যেতে পারব।

জাপানের অদূরে স্বল্প গভীর এক জলাশয়ে ইতিমধ্যেই জলের নীচে একটি হোটেল তৈরী হচ্ছে। হোটেলটি এমন ভাবে তৈরী করা হবে যাতে হোটেলের বাসিন্দারা সেখান থেকে মাছ প্রভৃতি জলের প্রাণীদের খেলা উপভোগ করতে পারবে।

সমুদ্রের তলায় এই ধরণের অনেক বাড়ী একদিন তৈরী হবে। কেমন করে এই সব বাড়ীর মধ্যে পৌঁছবে? সেটাও কোন সমস্যা হবে না। হয়ত কোন ব্যবসায়ী কোম্পানী এজন্য ডুবো-জাহাজ চালু করবেন।

জলের নীচে এই ধরণের বাড়ী তৈরী করা এখন আর খুব বড় একটা কঠিন কাজ নয় বিজ্ঞানীদের কাছে। জলের নীচে ভিত তৈরী করে তাতে এই ধরণের বাড়ী নোঙ্গর করে রাখা হবে। এমনভাবে তৈরী হবে, যে ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ আবহাওয়ায় এর কোন ক্ষতি হবে না।

সমুদ্র মানুষের কাছে একটা রহস্য হ'য়েই রয়েছে। পৃথিবীর তিন-চতুর্থাংশে যে ৩৩ কোটি ঘন মাইল জল রয়েছে তার তলদেশে যে অজানা সম্পদের অজস্র সম্পদ রয়েছে তার সন্ধানের উপযুক্ত সময় এসেছে।

সমুদ্রের অতলতলে যে অফুরন্ত সম্পদ রয়েছে, তা পৃথিবীকে বেশ সম্পদশালী করে তুলতে পারে। সোনা, তামা, লোহা, তেল প্রভৃতি বহু মূল্যবান পদার্থে সমুদ্রের ভাণ্ডার পরিপূর্ণ। এ-ছাড়া আছে গাছ-গাছড়া ও প্রাণী। আরও মজার কথা, সমুদ্রের তলাটা প্রকৃতির সম্পদের এক নিরাপদ গুদাম

বলা যেতে পারে। বাতাসের সংস্পর্শে এসে কয়লায় ক্রমাগত অক্সিজেন মিশতে থাকে এবং ক্রমে এমন একটা বিপজ্জনক অবস্থায় এসে পৌঁছয় যে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন না করলে তা আপনা থেকেই প্রজ্বলিত হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু জলের তলাটি কয়লার এক নিশ্চিন্ত আশ্রয়। এখানে এরকম কিছু ঘটতে পারে না।

সমুদ্র মানুষকে নানাবিধ খাদ্য যোগাতে পারে। সমুদ্রে কত জাতীয় মাছ, শামুক ইত্যাদি রয়েছে। চাষ করলে এ সবের সংখ্যা অনেক বাড়বে। প্রাকৃতিক শত্রুর কবল থেকে এদের বাঁচাতে হবে। এদের খাবারেরও ব্যবস্থা করতে হবে। তাহলেই একদিন এরা আমাদের খাদ্যের প্রয়োজন অনেকখানি মেটাবে। সামুদ্রিক আগাছাও মানুষের খাদ্য তালিকায় স্থান পেতে পারে। বস্তুতঃ, জাপানীরা তো এখনই সামুদ্রিক আগাছা খাদ্যরূপে ব্যবহার করছে।

জলের নীচে নামবার জন্য তাই বিজ্ঞানীদের চেষ্টার শেষ নেই। ১৯৬৩ সালে ক্যাপ্টেন কাস্টো পাঁচজন সঙ্গীকে নিয়ে লোহিত সাগরের ৩৬ফুট নীচে একটি ইস্পাতের তৈরি ঘরে একমাস কাল বাস করেন। এখন তিনি ওয়েস্টিংহাউস ইলেকটিক কর্পোরেশন কোম্পানীতে ডীপস্টার ডুবোজাহাজ নিয়ে কাজ করছেন। এই জাহাজটি তিনজন লোক নিয়ে জলের ১৩ হাজার ফুট নীচে নেমে যাবে। এই কোম্পানীটি নানা ধরণের ডীপস্টার ডুবোজাহাজ নিয়ে কাজ করছে। বিজ্ঞানীদের জলের ২০ হাজার ফুট নীচে নামিয়ে দেওয়ার জন্যও গবেষণা চলছে।

ডীপস্টার ৪০০০ নামে ডুবোজাহাজটি সমুদ্রের ৪ হাজার ফুট নীচে নেমে গিয়ে ২৪ ঘণ্টা অবস্থান করতে পারে।

এতদিন ধারণা ছিল শ্বাস-প্রশ্বাসের অসুবিধার জন্য ডুবুরীরা জলের ২৫০ ফুটের বেশি নীচে যেতে পারে না। কিন্তু হিলিয়াম ব্যবহার করে ডুবুরীদের শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ অনেক সহজ হয়েছে। ডুবুরীরা তাই এখন জলের অনেক নীচে নেমে ঘোরাফেরা করতে পারে অনেক সময় ধরে। এসব যন্ত্রপাতি আরও নিখুঁত করে তোলার জন্য গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে ওয়েস্টিং হাউস। তাছাড়া জলের তলায় শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ সহজভাবে সম্পন্ন করার জন্য একটি নতুন ধরণের যন্ত্রও তাঁরা পরীক্ষা করছেন। এই যন্ত্রটি এত শক্তিশালী হবে যে, শুধুমাত্র যন্ত্রটির এই সাহায্যেই মানুষ একদিন জলের ৩ হাজার ফুট নীচে নেমে যেতে পারবে।

সকলেই জানো অক্সিজেনের অভাব হলে মানুষ বাঁচতে পারে না। আমেরিকার জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানী এমন একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেছে, যা জলের মধ্যে থেকে শুধু অক্সিজেন টেনে বার করে নিতে পারে। তাহলে মানুষ জলের নীচে সহজেই বেঁচে থাকতে পারবে।

এসব প্রচেষ্টা থেকে মনে হচ্ছে, মানুষ হয়ত একদিন জলের নীচে বসতিস্থাপন করবে।

এক বুড়োবুড়ীর গল্প

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

কাজ যে করতে ভালবাসে, তার কাছে অন্য লোকের কুঁড়েমি একেবারে সহ্য হয় না। তাই যে গল্প তোমাদের বলতে বসেছি, সেই গল্পে এমনি এক কাজ-পাগল বুড়ী আর তার কুঁড়ে স্বামীটির মধ্যে রোজই তাই বিস্তর ঝগড়া। এমন কি মাঝে মাঝে বুড়ী তার স্বামীকে তিরস্কার করা ছাড়াও, লাঠি দিয়ে দু'এক ঘা পিটিয়েও দেয়।

বুড়োর তা'তেও হুঁস হয় না। বুড়ো পাহাড়ের কাছে ওদের ছোট্ট কুঁড়ে ঘরটা ছেড়ে বেরিয়ে যায় বাইরে বনে বাদাড়ে যেখানে ও পাখী বা ছোট ছোট জীবজন্তু ধরবার জন্যে ফাঁদ পেতে রেখেছে।

আর যেদিন ফাঁদে আটকে পড়ে একটা খরগোস বা মোটা-সোটা কোন পাখী, সেদিন বুড়ো মহানন্দে তা বাড়ীতে নিয়ে গেলে বুড়ীর মুখে তবু কিছুটা হাসি ফোটে। দু'একদিন বুড়োর ভাগ্যে বুড়ীর তিরস্কার জোটে না।

সেদিন অবস্থা খুব খারাপ। বাড়ীতে একটুও কিছু খাবার নেই। বুড়ী ত' রেগে আগুণ, রাগের মাথায় বুড়োকে ঝাঁটাপেটা করে বুড়ী বাড়ীর বাইরে পাঠিয়ে দেয়।

এ ত' হামেসাই ঘটে থাকে, তাই বুড়ো শিস দিতে দিতে বনের মধ্যে নিজের পাতা ফাঁদগুলোর কাছে চলে যায়।

প্রথম ফাঁদটায় আটকা পড়েছিল একটা সারস পাখী। বুড়ো ত' খুশীতে ডগমগ। সারসটাকে শুনিয়ে বলে উঠলো বুড়ো—'বাঃ আজ খাসা খাবার হবে তুমি আমাদের সারসমশায়। ফাঁদ থেকে বার করে তোমাকে মেরে বাড়ী নিয়ে যাব।'

আশ্চর্য, সারস বুড়োকে চমকে দিয়ে কথা বলে ওঠে—'আমাকে মেরো না দোহাই। আমি হচ্ছি সারসের রাজা। যদি তুমি আমাকে ছেড়ে দাও, তাহলে তোমাকে আমার যতদূর সাধ্য সাহায্য করব।'

বাবা, সারস মানুষের মত কথা কয়, বুড়ো ত' ভয়ে অস্থির। বুড়ো মনে মনে ভাবল, আহা যে সারস কথা বলতে পারে, তাকে মেরে ফেলাটা সত্যিই ভালো কাজ হবে না। বুড়ো তাই সারসটাকে ফাঁদ থেকে ছেড়ে দেয় আর সারসটা বুড়োকে ধন্যবাদ জানিয়ে উড়ে চলে যায়।

অন্য ফাঁদে কিছুই পড়ে নি, তাই খালি হাতেই বুড়োকে ফিরতে হল বাড়ী আর তার জন্যে বুড়ী ওকে দরজাই খুলল না। বসে বসে খাওয়া পাওয়া যায় না, বুড়ী ওর মুখের ওপর বাড়ীর দরজা

বন্ধ করে দেয়, আর তাই বুড়োকে সারারাত খোলা উঠোনে কাটাতে হয়। বুড়োর কিন্তু একটুও দুঃখ নেই তাতে।

পরের দিন বুড়ো ফাঁদের কাছে যেতেই কালকের সারসটি হঠাৎ এসে ওকে সুপ্রভাত জানিয়ে বুড়োর হাতে একটা থলি তুলে দেয়।

—'বুড়ো তোমাকে খুব ক্ষুধার্ত দেখাচ্ছে, এই নাও এটা ; তোমার খুব কাজে লাগবে।' সারস নিজের লম্বা ঠোঁট থেকে থলিটা মাটিতে ফেলেই চেঁচিয়ে বলে উঠল—'দু'জনা এস ব্যাগের বাইরে'।

বলা মাত্রই দু'টী ছোট কালো ছেলে থলি থেকে বেরিয়ে এল, সঙ্গে তাদের একটা টেবিল। চটপট ছেলে দু'টো টেবিলের ওপর সাদা চাদর বিছিয়ে ফেলল, আর তারপর আনল থরে থরে ডিসভর্তি খাবার। আর কি দামী দামী সেই খাবারগুলো!

বুড়ো একটুও দেরী না করে খেতে বসল, খেয়ে যেন আশ মেটে না। কোনটা ছেড়ে কোনটা খাবে ও!

বুড়োর খাওয়া হয়ে যেতেই সারস বলল—'দু'জনা থলিতে যাও। আর সঙ্গে সঙ্গে কোথায় গেল ছেলে দু'টো ; টেবিল খাবার ভর্তি ডিস সব ঢুকে গেল থলির ভেতর।

সারসের উপহার নিয়ে খুশী মনে বাড়ীর পথ ধরল বুড়ো। পথে যেতে যেতে মনে পড়ল বুড়োর বনের ধারে এক গরীব বুড়ীর কথা। বেচারী তিন মেয়ে নিয়ে কোন রকমে কাঠ কেটে সংসার চালায়। কোনদিন পেট পুরে খেতে পায় না। আহা, বেচারীদের আজ ভালো-মন্দ খাইয়ে গেলে কেমন হয়!

থলি থেকে দু'জনাকে বার করে, বুড়ো তাই ওদের বাড়ী গিয়ে সকলকে আশ মিটিয়ে খাইয়ে দেয়। ওরা মহানন্দে খায় আর মনে মনে ভাবে, কেমন করে এই অদ্ভুত থলিটা বুড়োর কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া যায়। বুড়ী আর তার মেয়েরা মনে মনে একটা মতলব ঠিক করে নেয়।

বুড়ী, বুড়োকে ভুলিয়ে তার বাগান দেখতে নিয়ে যায়; আর সেই ফাঁকে বুড়ীর মেয়েরা বুড়োর থলির মত দেখতে আর একটা থলি সেলাই করে ফেলে ঝড়ের বেগে।

ফিরে এসে বুড়ো নিজের থলির বদলে মেয়েগুলোর তৈরী থলি নিয়ে বাড়ী গেল।

বাড়ী গিয়ে বুড়ীর কাছে থলির মজা দেখাতে গিয়ে বুড়ো বোকা বনে যায়। একবার নয় বার বার ডাকল, থলির মধ্যের বাচ্ছা দু'টো ছেলেকে কিন্তু কেউ এল না। বুড়ী ত রেগে আগুণ, বুড়ো বয়সে তামাসা হচ্ছে না?

পরের দিন বুড়ো সকালে নিজের পাতা ফাঁদের কাছে যেতেই সারস এসে বলল—কাঠুরে বুড়ী আর তার মেয়েরা তোমার থলি চুরি করে নিয়েছে আমি জানি। এই নাও আর একটা থলি, এটা যদি ঠিক ভাবে ব্যবহার করতে পার, দেখবে এটাও তোমার খুব কাজে আসবে। সারস চলে যেতেই বুড়ো ভাবল, দেখাই যাক না কি হয়। আর যেই বুড়ো বলেছে দু'জনা বেরিয়ে এস থলি থেকে, অমনি

দু'টো ছেলে থলি থেকে বেরিয়ে এসে হাতে দু'টো চাবুক নিয়ে, আর বুড়োকে কিছু বলতে না দিয়েই সে কি মার!—'থাম, থাম বুড়ো চেঁচায়, কিন্তু ওর বরাতে জোটে আরও মার। হঠাৎ মনে পড়ে বুড়োর কথা—'দু'জনে থলির ভেতর যাও'। বুড়ো বলে কথাটা বিড় বিড় করে, সঙ্গে সঙ্গে দু'টী ছেলে অদৃশ্য।

তারপর বুড়ো হাজির হল সেই কাঠুরে বুড়ী আর তিন মেয়ের কাছে। থলিটা রেখে এবারে বুড়ো নিজের থেকেই বুড়ীর বাগান দেখতে গেল। বুড়ীর মেয়েরা ভাবল দেখা যাক, এ থলি থেকে কি বেরোয়।

বেরোল দু'টী ছেলেই, আর তারপর মেয়ে দু'টী মার খেয়ে চেঁচিয়ে বাড়ী ফাটাতে লাগল। ওদের মা এল ছুটে। ছেলে দু'টো মাকেও মারতে শুরু করে দেয়।

—'বাঁচাও বাঁচাও বুড়ো এ শয়তান দু'টোর হাত থেকে।' ওরা কান্না জুড়ে দেয়।

—'আমার আগেকার যে থলিটা চুরি করেছিলে সেটা ফিরিয়ে দাও।' মেয়েগুলো ছুটে গিয়ে আগেকার থলিটা ফিরিয়ে দেয় বুড়োকে। তারপর বুড়ো মনের আনন্দে শিস দিতে দিতে দু'টো থলি নিয়েই বাড়ী ফিরল।

কড়া নাড়তেই বুড়ী বেরিয়ে এল হাতে ঝাঁটা নিয়ে। বুড়ীর অবিশ্যি ঝাঁটাটা একটু পরেই হাত থেকে পড়ে গেল। যখন বুড়ো একটা থলির দিকে চেয়ে বলে উঠল—'থলে থেকে বেরিয়ে এসো দু'জনা'। দু'টী ছেলে বেরিয়ে এল এলাহি খাবারের ব্যবস্থা নিয়ে।

তারপর···বুড়ো-বুড়ী মনের আনন্দে ভর পেট খেয়ে নিল। খেতে খেতে বুড়ো ভাবল, বুড়ীকে একটু শিক্ষা দেওয়া দরকার, বড় হেনস্তা করে বুড়ী, বুড়োকে। বুড়ো ইচ্ছে করে, ভালো দু'টো ছেলের থলিটা নিয়ে চলে গেল অন্য ঘরে, এ ঘরে রেখে গেল দ্বিতীয় থলিটা।

বুড়ীর সখ হল নিজেই থলির মজাটা করে দেখবে। তাই বলে উঠল 'থলি থেকে বেরিয়ে এসো দু'জনা।' তারপর বুড়ী খেল বেদম মার। আর যত মার খায় তত চেঁচায়—'কোথায় গেলে, রক্ষে কর এদের হাত থেকে। এ কি কাণ্ড!

বুড়ো একটু পরে এসে ছেলে দু'টোকে থলিতে ঢুকিয়ে দিলে।

বুড়ীর চোখ দিয়ে জল পড়ছে। 'তুমি আমাকে বাঁচালে, আর তোমাকে কোনদিন কিছু বলব না।'

তারপর আর ওরা বুড়ো-বুড়ী। একটুও ঝগড়া করে না। বুড়ো কাজ না করলে বুড়ীর একটুও রাগ করবার দরকারই হয় না। কারণ যখনই বুড়ীর খাবার দরকার, বুড়োর সেই থলির ছেলে দু'টো ত' সব সময় তৈরী।

ইস, আমরাও যদি এমনি একটা থলি পেতাম! *

---

* রাশিয়ার রূপকথা।

কেমন করে হলো—ষ্টিম-ইঞ্জিন

সুনীল সরকার

সরা চাপা মাটির হাঁড়িতে জল যখন ফুটতে থাকে, তখন সরাখানা ঢক্‌ঢক্ ক'রে ওঠা-নামা করে, আগের দিনের মানুষও তা দেখেছে। কিন্তু ওই দেখা অবধি, কেন ঐ রকম ওঠা-নামা করে, তা' নিয়ে তখনকার মানুষ কোনরকম মাথা ঘামায় নি। তারপর অনেকদিন চলে গেলো।

এলো ইংরেজী ১৭৬৮ সাল।

জেমস্ ওয়াট নামে এক যুবক কেট্‌লিতে গরম জল করতে গিয়ে দেখলেন, জল যখন টগ্‌বগ্ ক'রে ফুটছে, তখন কেটলির ঢাকনাটা ঢক্‌ঢক্ ক'রে ওঠা-নামা করছে। বসে বসে তন্ময় হয়ে তিনি অনেকক্ষণ এ দৃশ্য দেখলেন। তারপর ঢাকনিটা তুলে নিলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে একগাদা সাদা ধোঁয়ার মত জিনিস ঊর্দ্ধাকাশে উঠতে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আবার কেটলির ওপর ঢাকনিটা চাপা দিলেন। কয়েক সেকেণ্ড পরে পুনরায় ঢাকনিটা ঢক্‌ঢক্ এবং ওঠা-নামা করতে লাগলো। শুধু তাই নয়, আশপাশ দিয়ে ফুটন্ত জলের সূক্ষ্ম কণিকা বার হতে লাগলো। এবার আর ওয়াটের বুঝতে বাকী রইলো না—ঐ যে সাদা ধোঁয়ার মত জিনিসগুলি প্রচণ্ড বেগে কেটলির মধ্য থেকে বেরিয়ে আসছে, ওগুলো কি? হ্যাঁ, ওইগুলোই ষ্টিম বা বাষ্প।

জেমস্ ওয়াট্ ভাবতে লাগলেন: জল ফুটে যে ষ্টিম হয়, নিশ্চয়ই সেই ষ্টিমের যথেষ্ট শক্তি আছে—আর সেই শক্তিই ঢাকনিটাকে ওঠা-নামা করানোর চেষ্টা করছে। যদি তাই হয়, তাহলে এই বাষ্পীয় শক্তিকে কি কোন কাজে লাগানো যেতে পারে না? এই ভাবনাই তাঁকে এক নূতন জিনিস সৃষ্টির পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো। তাইতো তিনি বাষ্পীয় শক্তিকে কাজে লাগিয়ে ষ্টিম-ইঞ্জিন তৈরী ক'রে বিস্ময় সৃষ্টি করেছিলেন। সেটা ইংরেজী ১৭৬৯ সালের কথা।

সেই থেকে এই ধরণের ষ্টিম-ইঞ্জিন আজ পর্যন্ত নানা কাজে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। অবশ্য পরবর্ত্তীকালে জেমস্ ওয়াটের ষ্টিম-ইঞ্জিনের অনেক অদল-বদল করা হয়েছে। হোক, তবু আমরা জানি এর সৃষ্টি কর্তা জেমস্ ওয়াট্।

পিঁপড়ের কথা

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্তী

মৌমাছিকে আমরা খুব পরিশ্রমী বলে জানি; কিন্তু পিঁপড়েও মৌমাছির চেয়ে বুদ্ধিতে বা পরিশ্রমে কিছু কম নয়। পিঁপড়েকে কখনও চুপচাপ থাকতে দেখা যায় না, এরা সব সময়ই চঞ্চল ও কর্মকুশল।

পিঁপড়ের অনেক জাতি দেখা যায়। কোন জাতি মাটির নীচে গর্ত ক'রে বাস করে, কোন জাতি বাঁশ বা কাঠের ফাঁকে থাকে, আবার কোন কোন পিঁপড়ে গাছের কয়েকটি পাতা একসঙ্গে জড়িয়ে তার মধ্যে বাসা বাঁধে।

পিঁপড়ের মধ্যেও স্ত্রী, পুরুষ ও কর্মী আছে। এদের প্রত্যেকের কাজ আলাদা।

প্রথমে ক্ষুদে পিঁপড়ের কথাই ধরা যাক্। এরা আকারে ক্ষুদ্র, রং লালচে। কামড়ালে অল্প জ্বালা করে। এরা মাটির নীচে গর্ত ক'রে বাস করে। কোনও মরা কীট-পতঙ্গ পেলে এরা দল বেঁধে তাকে টানতে টানতে নিয়ে যায়। এই কাজেই মাত্র মানুষের উপকার করে তারা। তাছাড়া মানুষের অনিষ্ট করতেই দেখা যায় এদের। লঙ্কা বা বেগুন চারায় লেগে এরা গাছটাকে মেরে ফেলে। ঘরে গুড়, চিনি কি নারকেল তেল, এদের উপদ্রবের জন্য সাবধান ক'রে রাখতে হয়। 'মিট সেফের' পায়ার নীচে জলের পাত্র না রাখলে এরা খাবারের মধ্যে চলে যাবে; এমন কি, অনেক সময় তেলের গন্ধে বিছানাতেও গিয়ে অধিষ্ঠান হয়।

আমাদের ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে। দুধের মধ্যে পিঁপড়ে থাকত। পিসিমা রাত্রে ভালো চোখে দেখতেন না। আমাদের দুধ দেওয়ার ভার ছিল তাঁর উপরে। আমরা পিঁপড়ে দেখে দুধ খেতে চাইতাম না। পিসীমা বলতেন—'জানিস, পিঁপড়ে খেলে সাঁতার শেখা যায়। চোখ বুঁজে চুমুক দিয়ে খেয়ে ফেল ও দুধটুকু।' আমরা অগত্যা সাঁতার শেখার লোভে খেয়ে ফেলতাম সেই পিঁপড়ে শুদ্ধ দুধ!

কাঠ পিঁপড়ে: রংটা কালচে। ফাটা বাঁশের ফোকরে এবং গাছের শুকনো ছালের নীচে এরা বাস করে। এদের হুল ও দাঁত আছে। কাঠ পিঁপড়ের কামড় অত্যন্ত জ্বালাকর। এরা কামড়ালে সেখানটা লাল হ'য়ে ফুলে ওঠে। চুণ লাগিয়ে রাখবার দরকার হয় তখন সেখানে। এরা যোদ্ধা পিঁপড়ে। তুমি তাদের ক্ষতি কর বা না কর, সুবিধা পেলেই তারা তোমাকে কামড়াবে। যেখানে কাঠ পিঁপড়ে থাকে সেখানে গেলেই দেখা যায়, পিঁপড়েগুলি রণং দেহি মূর্তিতে তৈরী হয়ে আছে তোমাকে কামড়াবার জন্য!

ডেঁয়ে পিঁপড়েঃ এদের দাঁত বেশ বড় এবং হুল নেই। বুলডগের মত এদের কামড়। এরা একবার কামড়িয়ে ধরলে ছাড়ানো শক্ত। এদের কামড়ে রক্ত পর্যন্ত বেরিয়ে যায়। ডেঁয়ে পিঁপড়ে কিন্তু গুড়কে চিনি ক'রে দিতে পারে। গুড়ের ভাঁড়ের মুখ যদি আলগা থাকে, সেখানে ডেঁয়ে পিঁপড়ে গিয়ে গুড়ের রসটা চুষে খায় এবং সেখানে কাশীর চিনির মত লালচে চিনি পড়ে থাকে!

সুড়সুড়ে পিঁপড়েঃ এরা খুব চঞ্চল ও দ্রুত ছোটাছুটি করে। আকৃতি ছোট এবং রংটা কালচে। এরা কামড়ায় না। কিন্তু সারাগায়ে ছড়িয়ে পড়লে খুব সুড়সুড়ি লাগে। সেই জন্যই বোধহয় ওদের ঐ রকম নাম।

গন্ধ বা গেঁধো পিঁপড়েঃ এদের দেখতে ক্ষুদে পিঁপড়ের মতই ছোট। এরা কামড়ায় না, কিন্তু দুধ বা অন্য কোনও খাবারের মধ্যে পড়লে এদের গায়ের দুর্গন্ধে খাদ্যটা অখাদ্য হ'য়ে যায়। দুধের মধ্যে ক্ষুদে পিঁপড়ে পড়লে তা এক রকম খাওয়া চলে, কিন্তু গেঁধো পিঁপড়ে পড়লে তা মুখে দেওয়া যায় না।

নালসো পিঁপড়েঃ দেখতে কতকটা লালচে কিন্তু টকটকে লাল নয়। আম, জাম, জামরুল, লিচু প্রভৃতি গাছে এরা বাস করে এদের হুল নেই, কিন্তু কামড়ে অল্প জ্বালা করে। সেইজন্য যে গাছে নালসোর বাসা থাকে, ছাই মেখে কেউ কেউ সেই গাছে ওঠে। গাছের পাতা বেঁকিয়ে নিয়ে, পুত্তলীদের মুখের লাল সুতোর জাল দিয়ে জড়িয়ে এরা বাসা বাঁধে। তাতে এরা ডিম পাড়ে। এরাও সৈনিক পিঁপড়ে। কেউ ওদের গাছে উঠতে গেলে যুদ্ধের ভঙ্গিতে ওরা লাইন ক'রে দাঁড়ায়।

আমরা যেমন গরু পুষি, ওরাও তেমনি এক রকম 'জাবপোকা' পুষে তার থেকে মিষ্টি রস আদায় করে। আমগাছের পাতায় সবুজ রংয়ের এক রকম ছোট ছোট পোকা হয়। তাদের ডানা হয় না, পা খুব ছোট। তাদের পিছন দিকে নলের মত দু'টি জিনিষ থাকে। তার থেকে ঐ মিষ্ট রসটা আসে। নালসো পিঁপড়ে এই পোকার ডিম তাদের বাসায় রাখে এবং ডিম থেকে জাবপোকা বেরুলে তার মিষ্ট রস খায়। এই সব জাবপোকা এক পাতা থেকে অন্য পাতায় যাবার সময় চটচট শব্দ হয়।

নালসোর সঙ্গে এক রকমের মাকড়সার চেহারার বেশ মিল দেখা যায়। এদের পিঁপড়ে মাকড়সা বলা চলে। এরা নালসোর ছদ্মরূপ ধরে ওদের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। নালসোর মত এদেরও গায়ের রং ইঁটের মত লাল। কিন্তু পিঁপড়ের তিন জোড়া পা ও একজোড়া চোখ আর মাকড়সার চার জোড়া পা ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে চার জোড়া চোখ। পিঁপড়ের মাথার উপর একজোড়া ক'রে শুঁড় থাকে কিন্তু মাকড়সার ও রকম থাকে না। তবুও দেখলে অবাক লাগে, ছদ্মবেশী মাকড়সারা চলবার সময় সম্মুখের দু'খানা পা পিঁপড়ের শুঁড়ের মত মাথার উপর তুলে ধরে রাখে যেন ওরাও নালসো-পিঁপড়ে!

এই মাকড়সা-নালসো কিন্তু যুদ্ধে কখনও আসল নালসোর সঙ্গে পেরে ওঠে না ; তাই মাকড়সা-নালসো সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। এরা দলছাড়া কোন নালসোকে পেলেই হঠাৎ আক্রমণ করে এবং মাকড়সার বিষে নালসোটি নিস্তেজ হয়ে পড়লে তাকে মুখে ক'রে নিয়ে পালিয়ে যায় এবং তার রস চুষে খায়।

নালসোর সঙ্গে ক্ষুদে পিঁপড়েরও মাঝে মাঝে লড়াই লাগে। কিন্তু নালসোরা আকারে অনেক বড় হ'লেও ক্ষুদে পিঁপড়ের মিলিত শক্তির কাছে তারা হার মানতে বাধ্য হয়।

আগেই বলেছি, পিঁপড়ের মধ্যেও পুরুষ, নারী ও কর্মী আছে। পুরুষ ও রাণী পিঁপড়ের ডানা জন্মায়—কিন্তু মাত্র একদিনের জন্য। তারপর তাদের জীবন শেষ! এইজন্য আমাদের দেশে একটা কথা আছে, পিঁপড়ের ডানা হয় মরিবার তরে।

কর্মী পিঁপড়ের ডানা গজায় না।

বন্যা বা বৃষ্টি আসবার আগে পিঁপড়েরা তা বুঝতে পারে। কোথায়ও বন্যা আসবার আগে পিঁপড়ের দল তাদের সাদা সাদা ডিম নিয়ে কোনও উঁচু নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেয়।

খুশির ধুম

শ্রীরমেন দাস

গাঙের জলে বান ডেকেছে
আকাশ ডাকে গুড়ুমগুড়্—
মাল্লা-মাঝি সবাই বলে ঃ
তালতলা ঘাট অনেক দূর !

পাল ছিঁড়েছে, হাল ভাঙা প্রায়
বৃষ্টিতে সব ভিজেই শেষ
খোকন বলে ঃ সন্ধ্যে হ'লো
এলেম কোথায়, এ কোন দেশ ?

গ্যাঙর গ্যাঙর ব্যাঙের ডাকে
হঠাৎ যখন ভাঙ্‌লো ঘুম—
খোকন দেখে দিদির বিয়ে
সাত মহলায় খুশির ধুম।

বিশ্বশ্রী মনতোষ রায়

আমার ভাই আর বোনেরা!

সবাই তোমরা ভাল আছো তো? শীত কিন্তু যাই যাই করছে। গত সংখ্যায় যেসব কথা বলেছি মনে রেখেছো? সেই নিয়মে চললে দেখবে কোন অসুখ-বিসুখ হবে না।

আমরা কেমন জানুয়ারী মাসের ১৯ তারিখে আমাদের ব্যায়াম প্রতিষ্ঠান থেকে সব ছেলেমেয়েদের নিয়ে বেহালা ছাড়িয়ে আরো ৮।১০ মাইল দূরে 'ভীষা' বলে একটি জায়গায় পিকনিক্ করতে গিয়েছিলাম। কি মজাই না হয়েছে সেখানে—প্রায় ৯০।৯৫ জন মানুষ একটা বিরাট বাসে ক'রে গেলাম। মেয়েদের হাডু-ডু খেলা একটি আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান হলো। যাবার আগে "গোদ্‌রেজ কোং" আমাদের অনেক সাবান, পাউডার ইত্যাদি দিয়েছিলেন। জিনিসগুলো পেতেই ঠিক ক'রে ফেললাম, তা দিয়ে আমরা "লাকী প্রাইজ" দেব। খবরটা সবাই জেনে ফেললো। লক্ষ্য করলাম, উৎসাহ আর আনন্দে একটা হুল্লোড় পড়ে গেলো সবার মধ্যে—কে পাবে? দেখা গেল, যাদের বাগানবাড়ীতে গেলাম, আমার সেই বন্ধু নৃপেনই পেলো 1st Prize. বাকী আরও ৫টা প্রাইজ ছিল, সব মেয়েদের মধ্যে সেগুলো পেলো। ছেলেরা কেউ তো ছিল না। কারণ খেলাটা ছিল North Calcutta Ladies *vs.* South Calcutta Ladies, জিতলো North Calcutta তারপর টেপ্ রেকর্ডে—গান-বাজনা, বক্তৃতা আরও কত কি। খাওয়া-দাওয়াও চমৎকার হয়েছে। এ জাতীয় পিকনিকের একটা মস্ত বড় দিক আছে। সেটা হল—অনেক মানুষের সাথে মিতালী এবং ভাব ও রুচির আদান-প্রদান হয়ে মনুষ্য চরিত্রের কতগুলি অজানা দিকের সাথে পরিচিত হওয়া যায়। তাছাড়া মুক্ত আলো, হাওয়া ও নির্দোষ আনন্দোচ্ছল ক্ষণটি দেহ ও মনকে একঘেয়েমীর হাত থেকে মুক্ত করে। পার যদি তোমরাও করো, কেমন?

৺সরস্বতী পুজায় আনন্দ করলে কেমন?

কলকাতায় ২৩শে জানুয়ারীর উৎসব হলো। কিন্তু মন ভরেনি। দেখলাম, ছন্দ পতনে ভরা।

শোন, ৯ই মার্চ Junior Mr. India Contest হবে কুমারটুলীর কাছে বাগবাজার জিমন্যাসিয়ামে। তোমাদের নেমন্তন্ন রইলো। বিকেল ৫টায় এসো, কেমন?

এবার বহু জায়গায় ব্যায়াম প্রদর্শনী করেছি। বাঁকুড়া, সোনামুখী, মাতৃ-পিতৃহীন সঙ্ঘের সাহায্য রজনী—বারাকপুর, বালী, বৈদ্যবাটী অনির্বাণ সঙ্ঘ—লিলুয়া আরও অনেক জায়গায়। সবগুলোই সাহায্য রজনী হিসেবে। এগুলি করতে আমি খুব ভালোবাসি। তোমরা ডাকলেও আসবো জেনো।

যাক্, এ-সব কথা রেখে এখন চিঠি-পত্রের উত্তর দেই, কেমন? অনেক চিঠি জমে গেছে। ভাল কথা, আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। যদি ব্যক্তিগত জবাব পেতে চাও এবং সত্যিই তাতে জানাবার মত কিছু থাকে, তাহলে সঙ্গে উপযুক্ত ডাক টিকিট দিতে যেন ভুলে যেয়ো না। নইলে সব্বাইকে জবাব দেওয়া খুব অসুবিধা হয়ে পড়ে। আর একটা কথা, প্রশ্নগুলি লেখবার আগে বেশকরে গুছিয়ে চিন্তা ক'রে নতুন অথচ সহজ ক'রে প্রশ্ন করবে। একঘেয়ে অনেক প্রশ্ন আসে ওগুলো বাদ দিতেই হয়। অনেকে কেমন উদ্ভট উদ্ভট প্রশ্ন করে শোন—যোগ আর যোগাসনে কি তফাৎ? বলি ঐ প্রশ্নের জবাবে তোমার কি হবে? ও তো বড়দের কঠিন প্রশ্ন? আবার বলে, ব্যায়াম না ক'রে শরীর ভাল করার ব্যবস্থা দিন। খাওয়া না কমিয়ে রোগা করতে পারবেন? ক'বেলা ব্যায়াম করতে হবে? পড়তে ভাল লাগে না, কি করি বলুন তো? বাবার খুব পেট খারাপ, কমিয়ে দেবেন? মা একটুতেই খুব করে আমায় বকেন, এর কোন আসন আছে? ঘুমের চোখে নাক-ডাকার ব্যায়াম দিন। বন্ধুরা আমায় গাধা বলে, রেগেমেগে আমি পাঁঠা বলায় পিঠে কি কিল, দু'দিন ব্যথায় মরি আর কি—কি ব্যায়াম করবো বলুন তো ব্যথার জন্য? সত্যি বলুন না আপনি কালো না ফর্সা, বাজি হয়েছে আমাদের মধ্যে। চুল কোঁকড়াবার কি ব্যায়াম আছে—দেবেন? এতো চঞ্চল কেন আমি বলতে পারেন? নাম করেছেন বলে কি আপনার অহঙ্কার হয় না? মাঝেসাজে অসুখ হওয়া ভাল, তাতে দেহে নাকি নতুন শক্তি ঢোকে, সত্যি? ইত্যাদি এমন অনেক অপ্রিয় সত্য প্রশ্ন ক'রে আমায় বিরক্ত করে। আচ্ছা তোমরাই বল, এসব কথার আমি কি উত্তর দিতে পারি? বুঝি, অপক্ক মনের এগুলি কৌতূহল, তাহলেও একটু বুদ্ধির সাহায্য নিলে এগুলিকেই কত মার্জিত এবং বেশ শিক্ষামূলক ক'রে গড়ে তোলা যায়, সত্যি কিনা বল তো? সুতরাং বেশ হিসেব ক'রে অজানা জিনিস জানবার আগ্রহ প্রকাশ করো, নিশ্চয়ই তোমাদের জবাব দেবো। তোমাদের নাম ঠিকানা পরিষ্কার ক'রে লিখবে।

ব্যায়াম সম্বন্ধে বেশ জ্বালাময়ী অথচ শিক্ষামূলক ছন্দময় কবিতা লিখে পাঠাও ২০।২৫ লাইনের মধ্যে। এবং দু' পৃষ্ঠা ব্যাপী গদ্য। পদ্য ও গদ্যের প্রথম থেকে তৃতীয় স্থানাধিকারীদের লেখাগুলি আমরা শিশুসাথীতে **"ব্যায়ামে পদ্য-গদ্য প্রতিযোগিতা"** পৃষ্ঠায় প্রকাশ করবো। আগামী **১লা বৈশাখের** সংখ্যায় প্রথম প্রকাশ হবে সুতরাং তোমরা **ফাল্গুন মাসের ১০ তারিখের মধ্যে** আমার বাড়ীর ঠিকানায় লেখা অবশ্য পাঠাবেই—মনে থাকবে? সঙ্গে তোমাদের ছবি পাঠাবে। পরিষ্কার ভাবে নিজের নাম, বয়স, ঠিকানা এবং পেশা ইত্যাদি সহ সম্ভব হলে তা'ও প্রকাশ করবো। ঘাবড়াবে না—ঘন ঘন লেখো তারপর দেখবে সুন্দর হয়ে আসছে। বড়দের সাহায্য নিও না নিজের

মন-বুদ্ধি ও শিক্ষার সাহায্য নিয়ে লিখবে তাতে ফল ভাল হবে, এবার আমি প্রশ্নগুলির উত্তর দিচ্ছি শোন।—

উজ্জ্বল সিংহ (আমরু, বিহার)। প্রঃ—বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যায়াম বীর কে? ব্যায়াম বা শরীর চর্চা ক'রে শরীরে শক্তি হয় কি রূপে? আধুনিক কালে কোন দেশ ব্যায়ামে অগ্রণী?

উঃ—বিদেশে—জন্‌গ্রিমেক্, ষ্টিভ্‌রিভ্‌স্, রেজপাক্, বিলপার্ল এমন অনেকেই আর আমাদের দেশে বিষ্ণু ঘোষ, মনোহর আইচ। ব্যায়াম করলে শরীরের রক্ত খাদ্যসার সহজে গ্রহণ করে এবং পেশী, মেদ-মজ্জা-স্নায়ুর ভরণ-পোষন ঠিকমত হয় বলে। বর্তমানে আমেরিকা আর ভারতবর্ষের এই বাংলা।

যমুনা (কৃষ্ণনগর)। প্রঃ—বুকে যন্ত্রণা হয়—ডাক্তার বলেছেন পেট থেকে হচ্ছে, কি ব্যায়াম করবো?

উঃ—পেট থেকে মানে বায়ু থেকে হচ্ছে—সুতরাং পবন মুক্তাসন উড্ডীয়ান বন্ধ নিয়মিত করতে পারো। রাত্রের খাওয়া ৮টার ভেতর হালকা জাতীয় খাদ্য খাবে আপাততঃ।

পরিতোষ রায় (কলিকাতা)। প্রঃ—জল খাই, যা-ই খাই, বদ হজম হয়ে যায়—কি আসন করবো বলুন তো?

উঃ—পেটে আম আছে, বায়ুও আছে। পাকাবেল খুলে ভিজিয়ে রাখবে, সকালে খালিপেটে ঐ জলটা ঘোলের সঙ্গে মিশিয়ে রোজ খাবে, সেদ্ধ খাও তেল, ঘি বন্ধ কর। রাত্রে চিড়ের ভাত খাবে, তরকারী খাবে না তার জুস্‌টা আপাততঃ খাও, মাছ খাবে।

আশীষ ভূঞ্যা (মুড়িভাঙ্গা)। প্রঃ—সর্ব্বাঙ্গাসনের উপকারিতা কি? কি ব্যায়ামে ছাত্র ছাত্রীদের মেধাশক্তি বৃদ্ধি হয়?

উঃ—দেহের সর্বঅঙ্গের ব্যায়াম হয়ে রোগ মুক্ত করে। আর ধ্যানাসন করলে কাজ হবে।

উৎপলা চৌধুরী (নারাণপুর, বালুর ঘাট)। প্রঃ—অনেক দূরে থাকি নচেৎ কাছে এসেই বলতাম। ব্যায়াম ভালবাসি। আপনার ১৩৭৫ ভাদ্র মাসের সংখ্যায় দেওয়া ব্যায়ামগুলি করি। লম্বা হতে চাই। বয়স তো ১৬ পার হতে চললো কি করি বলুন তো?

উঃ—ক'রে যাও, কাজ হবেই। লম্বা হবার জন্য তার সঙ্গে শশঙ্গাসন, ধনুরাসন, অর্দ্ধমৎসেন্দ্রাসন করো ৩ বার ক'রে ১ মিঃ ক'রে প্রতিবার এবং ৩০ সেঃ প্রতিবার বিশ্রাম দিয়ে বুঝলে?

নিদারুণ ও পল্লবী রায় (কোলকাতা)। প্রঃ—আপনার Special Keepfit class কোথায় হয় ও চাঁদা কত? কবে কবে?

উঃ—আমার বাড়ীতেই 1/1-D, Naya Ratna Lane, (Shymbazar) Cal-4. মেয়েদের শুক্রবার বিকেল ৩টা থেকে ৬টা এবং ছেলেদের শনিবার বিকেল ৩টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত । দু'টোতেই ভর্তি ফি ২৲ এবং মাসিক ২০৲ টাকা, প্রথম ২২৲ টাকা। এসো, কেমন?

কুহু, কেকা, বুবু, চুণী ও সমীরণ জানা (জাহানাবাদ)। প্রঃ—দাঁত দিয়ে রক্ত পড়ে।

উঃ—নিমডাল দিয়ে দাঁত মাজবে।

হেমন্ত ব্যানার্জি (তেলনীপাড়া)। প্রঃ—বুকে সারা বছর সর্দি লেগেই থাকে, কি করি ?

উঃ - শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম করবে ফাঁকা জায়গায়। পেট পরিষ্কার করবে।

শ্যামল জানা (মেদিনীপুর)। প্রঃ—আপনি কি ব্যায়ামের যাদু বলে বয়সের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছেন ? বাংলা দেশে কবে থেকে ব্যায়াম চর্চা চলছে ?

উঃ—হ্যাঁ, তুমি ঠিক বলেছো। পুরাদমে শুরু হয়ে গিয়েছিল ১৯২৬ সালে ব্যায়ামাচার্য চরণ ঘোষের প্রচেষ্টায়। আজ থাক, কেমন ? ইতি।

তোমাদের—মনতোষদা

———

শ্রীঅমিতাভ

ঢেউ, ঢেউ আর ঢেউ, তার মাথায় ভাসতে ভাসতে চলেছে ছোট্ট তরী 'কনেজী আঙ্গরে'। দাঁড় বেয়ে চলেছেন দুই নির্ভীক তরুণ পিনাকী চ্যাটার্জী আর লেফটেন্যান্ট ডিউক—লক্ষ্য আন্দামান। পিনাকী চ্যাটার্জী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শরীর তত্ত্বের গবেষণা করছেন আর লেফটেন্যান্ট ডিউক হলেন ভারতীয় নৌসেনার তরুণ অফিসার। খোলা নৌকায় শুধু টিনজাত খাদ্য তাও মাত্র ষাট-দিনের মত সম্বল ক'রে হাজার মাইলের সাগর পাড়ি দেবার অসীম সাহসিক প্রচেষ্টা। কলকাতায় ম্যান ও ওয়ার জেটি থেকে ১লা ফেব্রুয়ারী এভারেস্ট বিজয়ী তেনজিং নোরকে পিস্তল ছুঁড়ে এঁদের শুভযাত্রা সূচিত করেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীত্রিগুণা সেন। হাজার হাজার নর-নারী গঙ্গার তীরে উপস্থিত হয়ে তাঁদের শুভযাত্রা কামনা করেন জয়ধ্বনি দিয়ে। আমরাও এই দুই বীর তরুণের শুভযাত্রা কামনা করি।

ইডেনের মাঠে ইতিমধ্যে দুই ক্রিকেটের আসর শেষ হল। টেস্টম্যাচ নেই তাই দুধের স্বাদ ঘোলেই মেটাতে হল কলকাতার উৎসাহী ক্রিকেট দর্শকদের। একটি দলীপ ট্রফির সেমিফাইন্যাল খেলা আর অন্যটি রাজ্যপাল একাদশ আর প্রধানমন্ত্রী একাদশের প্রদর্শনী খেলা বন্যাত্রানের জন্য।

হারজিতের টাগ অফ ওয়ারে দলীপ ট্রফির দক্ষিণাঞ্চল আর পূর্বাঞ্চলের খেলাটি যথেষ্ঠ উত্তেজনা এনেছে। খেলায় বোলারদের পোয়াবারো, আড়াই দিনে পড়েছে চল্লিশটা উইকেট। ব্যাটসম্যানেরা অবশ্য মনে মনে হয় পিচকে গাল পেড়েছেন। ব্যাটসম্যানেরা উইকেটে দাঁড়িয়েছেন পরাজিত সৈনিকের মত। বিশেষতঃ পূর্বাঞ্চলের ব্যাটসম্যানদের দৈন্যদশার কথাই বলছি। প্রথম ইনিংসে প্রসন্ন আর ভেঙ্কটরাঘবনের স্পিনের সামনে ব্যাট নিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে উইকেট খুইয়েছেন। আর দ্বিতীয় ইনিংসে গোবিন্দরাজ আবিদ, জয়সীমা আর ভেঙ্কটরাঘবনের আক্রমণে সর্বহারা হয়ে মাত্র ৪৮ রানে খেলা খতম করেছেন। পূর্বাঞ্চলের দুই তরুণ বোলার সুব্রত গুহ আর দিলীপ দোসীর মারাত্মক বোলিং দুই ইনিংসেই দক্ষিণাঞ্চলকে নাজেহাল করে পূর্বাঞ্চলকে জয়ের রোশনাই দেখিয়েছিল, কিন্তু ব্যাটসম্যানেরা যে রোশনাইকে আলেয়ায় পরিণত করে ছেড়েছেন।

এডিলেডের অস্ট্রেলিয়া ওয়েস্ট ইণ্ডিজের চতুর্থ টেস্টের নাটকীয় পরিমসাপ্তি ঘটল অমীমাংসিত ফলাফলে ব্রিসবেনের সেই ঐতিহাসিক "টাই টেস্টের" পর ক্রিকেটের মাঠে এই সদ্য সমাপ্ত টেস্টের মত এমন টেস্ট আর হয়নি বলেই মনে হয়। ওস্টেস ইণ্ডিজের একটি টেস্টজয় আর অস্ট্রেলিয়ার দুটি টেস্টজয়ের ফলাফল নিয়ে সিরিজের ফলাফল ২—১। এডিলেডের চতুর্থ টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজদলের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় পুরাতন জৌলুস ফিরে আসায় খেলা চরম উত্তেজনা আর আকর্ষনের পথে মোড় নেয়। এই ম্যাচে শেষদিন রেডপাথকে আউট করার ব্যাপারে গ্রীফিথকে কেন্দ্র করে বিরাট সমালোচনার ঝড় উঠেছে। বোলার প্রান্তের ক্রিজ ছেড়ে বাইরে থাকার দরুণ গ্রীফিথ বল করতে এসে হাত ঘুরিয়ে বলটি ফেলে রেডপাথের বিরুদ্ধে আউটের আবেদন করেন, ক্রিকেটের কেতাবী আইন অনুসারে আম্পায়ারের আঙ্গুল ওপরের দিকে ওঠে। এমন সকলের লক্ষ্য পঞ্চম ও শেষ টেস্টের দিকে।

ব্যাঙ্গালোরে মহীশূর আর বাংলাদলের রঞ্জীট্রফির সেমিফাইন্যালের খেলাটিতে দর্শকদের হামলা তৃতীয়দিনে চা পানের বিরতির পর খেলা বানচাল হল। পুলিশ টিয়ারগ্যাস আর লাঠিচার্জ করল আর হামলাবাজরা চালাল ইঁট, বোতল আর লাগায় আগুন। বাংলাদলে প্রথম ইনিংস ২৫১, দ্বিতীয় ইনিংসে ৫৮, মহীশূরের প্রথম ইনিংস ১৮৮ রান আর ২০ রানে ৬ উইকেট।

নতুন ধাঁধা

শ্রীতরুণ বসু চৌধুরী

(১)

শিকলের কলে কাটা,
শির শিশুর ছাড়
সাপের পেট কাট
ছাড় সাথীর সার।

(২)

ধনদেবীর এক নাম আছে মোর নামে।
খেতে আমি মিষ্ট তাই প্রিয় ধরাধামে॥
মধ্যের অক্ষর ছেড়ে দিনু তবু খাদ্য ভাই।
শেষের অক্ষর ছেড়ে দিলে অল্প অর্থ পাই॥

(৩)

মুণ্ডহীন করে মোরে খাও ভাই তুমি।
পেট যদি কাট তবে জলাশয় আমি॥
তিন অক্ষরে নাম মোর খুবই সরল।
মিছে এত ভাবছো তুমি হইবে বিফল॥

(৪)

চার অক্ষরে নাম তার অতি বলবান।
সমুখে যেওনা তার হবে চিৎপটাং॥
মাঝের সব ছেড়ে দিয়ে বনেতে চলো।
শেষার্দ্ধ ছেড়ে দিয়ে মোর ধাঁধা বলো॥

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

১। **আপণ, আপন।** ২। **রসনা, রস।** ৩। **চাল, চাল।**
৪। **গোলোক, গোলক।** ৫। **টক, টক।** ৬। **পাতা, পাতা।**

উত্তরদাতাদের নাম

প্রথম স্থান: ফাগুরাম সোরেন (১৮৩৯৫), পারমিতা, দাদু, দিয়ামা, মা, বাপি ও সংহিতা (১৫৮৬৩); **অমিতাভ, অম্বরীষ, অরিন্দম, অভিজিত ও গৌরী** (২১০১৬)।

দ্বিতীয় স্থান: রমেন্দ্রনাথ অধিকারী (১১০২৪); দিলীপ ও দেবু ব্যানার্জী (বীরভূম); **অতনু,** প্রতীপ, সান্ত্বনা, **অমিত ও ফাল্গুনী** (২০৬২৫৪); মঃ সামসুজ্জহা, জয়কালী মুখার্জী, অশ্বিনী মুখার্জী, মদন মণ্ডল ও ধনপতি মণ্ডল, কাষ্টগড়া প্রঃ বিদ্যালয়, বীরভূম।

সম্পাদিকার চিঠি

ছোট বন্ধুরা,

তোমাদের চিঠি লেখার সময় সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে চলেছে ভোটগণনার পর্ব। নিদারুণ উত্তেজনার পর নির্বাচনের গুরুত্বপূর্ণ কাজ সমাপ্ত। জনগণের নির্বাচনে দেশসেবার গুরুদায়িত্বভার যাঁদের দেওয়া হবে, তাঁদের প্রতি দেশবাসীর অনেক আস্থা, অনেক আশা আছে। দেশের সমস্যা দূর করে দেশের সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তার তাঁরা যথার্থ রক্ষক হোন, জনসাধারণের এই আকাঙ্ক্ষা। আশাকরি নবগঠিত সরকার, দেশবাসীর শুভেচ্ছায়, স্থায়ীভাবে, শান্তিতে পশ্চিমবঙ্গকে নূতন অগ্রগতির পথে নিয়ে যেতে পারবেন। এখন প্রতি মুহূর্তে খালি অধীর আগ্রহে নির্বাচনের সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করা।

এবারের অন্যতম উল্লেখযোগ্য সংবাদ, এক্সপ্লোরার ক্লাবের উদ্যোগে তরুণ ভারতীয় অভিযাত্রী লেফটেনান্ট আলবার্ট ডিউক ও পিনাকীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের দুঃসাহসিক সাগর অভিযান। ছোট্ট নৌকোয় দাঁড় টেনে অকূল সমুদ্র পাড়ি দিয়ে এঁরা পৌঁছবেন আন্দামান। এই দুই তরুণ অভিযাত্রী জয়যুক্ত হোন, শিশুসাথীর ছোট বন্ধুদের পক্ষ থেকে তাঁদের এই শুভকামনা জানাই। অভিনন্দন জানাই তাঁদের মনোবল ও সাহসকে।

মহাকাশযাত্রার ইতিহাসে সোভিয়েট রাশিয়া ইতিমধ্যেই এক নূতন অধ্যায় সংযোজিত করেছে। গত ১৬ই জানুয়ারী, পৃথিবী থেকে ১৫০ মাইল উপরে একই কক্ষপথে রাশিয়ার মহাকাশযান সোয়ুজ ৪ এবং সোয়ুজ ৫-কে নিয়ে যাওয়া হয়। 'সোয়ুজ' কথাটির অর্থ হল 'মিলন'। এই দু'টি সোয়ুজকে এরপর একসঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। সোয়ুজ ৫ থেকে পরপর বেরিয়ে আসেন শ্রীযুক্ত থ্রুনফ্ এবং শ্রীযুক্ত এলিসিয়েফ। মহানন্দে মহাশূন্যে হেঁটে বেড়ান তাঁরা। মহাশূন্যের পদযাত্রা শেষে তাঁরা সোয়ুজ ৫-এ না উঠে, উঠলেন সোয়ুজ ৪-এ। এই প্রথম মহাকাশে গাড়ী বদল করা সম্ভব হল। অল্পদিনের মধ্যেই যে মহাজাগতিক স্টেশন তৈরী করা সম্ভব হবে, এ তারই শুভ সূচনা। তোমরা যখন বড় হবে, তখন তো আর এ-সব খবর নূতন থাকবে না। তখন দোল কিংবা ইস্টারের ছুটিতে অনায়াসেই মহাকাশে ঘুরে ফিরে, মহাশূন্যের স্টেশনে হাওয়াইগাড়ী বদল করে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে বেড়ান শেষ করে, নূতন উদ্যমে ভরপুর হয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসবে তোমরা। অদূর ভবিষ্যতে মানব-

সভ্যতার জন্য বিজ্ঞান যে কি আশ্চর্য উপহারের সম্ভার নিয়ে অপেক্ষা করে আছে, সেই বিস্ময়ের চমক আধুনিক মানুষ ক্রমেই জানতে পারছে।

সম্প্রতি শ্রীযুক্তা কোরেটা কিং ভারতবর্ষে এসেছিলেন। ইনি নিহত নিগ্রোনেতা রেভারেণ্ড মার্টিন লুথার কিং-এর স্ত্রী। ১৯৬৬ সালে রেভারেণ্ড কিংকে প্রদত্ত নেহরু পুরস্কার নিতে এসেছিলেন শ্রীমতী কিং। ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মানজনক পুরস্কার জওহরলাল নেহরু অ্যাওয়ার্ড ফর ইণ্টারন্যাশনাল আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং।" এর পরিমাণ একলক্ষ টাকা ১৯৬৫ সালে প্রথম এই পুরস্কার দেওয়া হয় রাষ্ট্রসঙ্ঘের জেনারেল সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত উ থাণ্টকে। শ্রীমতী কিং তাঁর স্বামীর অসমাপ্ত কাজ পূর্ণ করে চলেছেন। নিগ্রোজাতির মুক্তি আন্দোলনে তিনি তাঁর স্বামীর আদর্শকেই অনুসরণ করছেন। শ্রীমতী কিং জানিয়েছেন, নেহরু পুরস্কারের অর্দ্ধেক ব্যয় করা হবে তাঁদের নিজস্ব আন্দোলনে। বাকী অর্দ্ধেক দিয়ে তৈরী হবে একটি ফেলোশিপ। তাতে একজন হরিজন আমেরিকার "ইনস্টিটিউট অফ নন ভায়োলেন্স সোশাল চেঞ্জ অ্যাণ্ড আফ্রো-এশিয়ান স্টাডিজ"-এ শিক্ষা-গ্রহণ করবে।

তোমরা শুনলে খুশী হবে, ছোটদের এবং বড়দেরও প্রিয় লেখিকা শ্রীযুক্তা লীলা মজুমদার এবার 'রবীন্দ্রপুরস্কার' পেয়েছেন। আরো দু'জন সুপরিচিত লেখক এই পুরস্কার পেয়েছেন, তাঁরা হলেন শ্রীযুক্ত নারায়ণ সান্যাল (বিকর্ণ) এবং শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র। এঁদের সকলকেই অভিনন্দন জানাই।

শুভেচ্ছা ও প্রীতি নিও তোমরা।

১লা, ফাল্গুন, ১৩৭৫

শুভার্থিনী—
তোমাদের সম্পাদিকা

সম্পাদিকা—শ্রীমতী দাশগুপ্ত
৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীনারসিংহ প্রেস হইতে
শ্রীরামকৃষ্ণ পাল কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

আয়ুর্বেদীয় অকৃত্রিম ঔষধ প্রস্তুতির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

আশুতোষ ঔষধালয়

ত্রিকালদর্শী ঋষিগণের উদ্ভাবিত, বিশেষজ্ঞ কবিরাজগণের তত্ত্বাবধানে
এবং উৎকৃষ্ট শাস্ত্রীয় উপাদানে প্রস্তুত

—চ্যবনপ্রাশ—

শরীরের সকল প্রকার ক্ষয়নাশক; শ্বাস-যন্ত্র পীড়ায় এবং পুষ্টি, বল, বীর্য, কান্তি ও মেধাবর্ধক মহৌষধ এই চ্যবনপ্রাশ। বাল্য, যৌবন ও বার্ধক্যে নিত্য ক্ষয়শীল দেহের ক্ষয়, এই মহৌষধ সেবনে নিবারিত হইয়া মানুষকে সর্বদা কর্মক্ষম, উৎসাহ ও উদ্দীপনাপূর্ণ করিয়া রাখে। আধুনিক বিজ্ঞান মতে চ্যবনপ্রাশে এ, বি, সি, ডি, ই এবং জি, ভাইটামিনের অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। মাত্রা—½ তোলা হইতে ১ তোলা কিঞ্চিৎ মধু ও ছাগ-দুগ্ধ (অভাবে গো-দুগ্ধ) সহ সেব্য। প্রতি কিলো ১৬·০০ টাকা। ২৫০ গ্রাম ৪·০০, ১৬০ গ্রাম ৩·২০, ৮০ গ্রাম ১·৬০ ও ৪০ গ্রাম ০·৮০ পয়সা মাত্র।

—দশন সংস্কার চূর্ণ—
(মাজন)

সুশ্রী দাঁতের পাটীতেই মুখের সৌন্দর্য্য। আপনার মুখ—স্বাস্থ্য ও রোগ দুইয়েরই প্রবেশ পথ। আমাদের প্রথম আয়ুর্বেদীয় প্রসাধন সামগ্রীর এটি অন্যতম। এই মাজনে মুখের দুর্গন্ধ নাশ করে, রক্ত ও পুঁজ পড়া, দাঁত ব্যথা বা ফুলা, পাইওরিয়া, কেরিস্ ইত্যাদি দাঁত ও মাড়ির পীড়ার মহৌষধ। এই মাজন ব্যবহারে দাঁতকে মজবুত রাখে, সুদৃঢ় ও সমুজ্জ্বল করে।

দন্তক্ষয় রোগে আপনার একটি দাঁতও যদি একবার আক্রান্ত হয় এবং ঐ দাঁতের চিকিৎসা সময়ে না করা যায়, তাহা হইলে সারাদেহে উহার সংক্রামন হইতে পারে। ছোট কৌটা—০·৭৫, মাঝারি কৌটা—১·৪০, বড় কৌটা—২·৫০।

ভাস্কর লবণ ● ভাস্কর বজ্র ● ভাস্কর যোগ

নানাবিধ উৎকট পেটের পীড়া এবং তজ্জনিত সকল রকম উপসর্গ ইহা নিঃশেষে আরোগ্য করে। শত শত রোগী আমাদের এই মহৌষধ সেবন করিয়া শতমুখে ইহার প্রশংসা করিয়াছেন। বড় শিশি—২·০০, মাঝারি শিশি ১·০০, ছোট শিশি ০·৫০ পয়সা।

আশুতোষ ঔষধালয়—ঢাকা

৫-বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

ফোন ঃ ৩৪-১৫৬৪

আশুতোষ লাইব্রেরীর নামকরা লেখকদের লেখা

শিশু ও কিশোরদের উপযোগী কয়েকখানি বই

কার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্তের

গোপাল ভাঁড়ের গল্প ১·০০

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

শঙ্কর (১ম) ১·২৫ **শঙ্কর** (২য়) ১·২৫

মৃত্যুঞ্জয় রায়ের

অলিভার টুইষ্ট ১·২৫

স্বপনবুড়োর

প্রেতপুরী ১·৫০

ডাঃ বৃন্দাবন বাগচীর

চকোলেট ১·৫০

রমেশচন্দ্র দাসের

সাগরিকা (১ম) ২·০০

সাগরিকা (২য়) ২·০০

বিজনবিহারী ভট্টাচার্য্যের

বাংলার মনীষী ২·০০

রবীন্দ্রনাথ ঘোষের

টাওয়ার অব্ লণ্ডন ২·২৫

রমেশচন্দ্র দত্তের

মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত ও বঙ্গ-বিজেতা (একত্রে) ৩··

আশুতোষ লাইব্রেরী— ৫, বংকিম চাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকতা-১২

Phone : 67-3329

Good Dog-Chuck means that of :—

NATIONAL

MACHINE TOOLS CO.

(N. M. T. Co.)

Manufacturers, Repairers and Dealers.

Head Office & Factory :—

10/10, Brindaban Mullick Lane, Kadamtala, Howrah.

(W. B.)

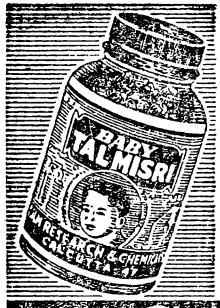

বেবী তালমিশ্রি

পশ্চিম বঙ্গ সরকার কর্তৃক
সর্বত্র প্রদর্শিত ও বিক্রীত

পাম রিসার্চ এণ্ড কেমিক্যালস
কলিকাতা

শ্যামশ্রী কেশ তৈল

*** আয়ুর্বেদীয় কেশবর্ধক উপাদানে প্রস্তুত ***

(সুগন্ধিযুক্ত)

মাথা ঠাণ্ডা রাখে—চুলের শ্রীবৃদ্ধি করে, কেশ পতন নিবারণ করে ও কেশের অকাল-পক্কতা বন্ধ করে। কেশগুচ্ছের স্বাস্থ্যরক্ষায় অদ্বিতীয়।

প্রতিশিশি—১·৮৮ তিন শিশি—৫·২৫

ছয় শিশি—১০·০০

আশুতোষ ঔষধালয়—ঢাকা

৫-বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট,

কলিকাতা-১২

শিশু-সাহিত্যের অন্যতম দিক্‌পাল

স্বপনবুড়ো রচিত—নতুন নাটক

নিবেদিতা ১·২৫

বিদেশিণী হলেও যিনি আমাদের প্রাতঃস্মরণীয়া, সেই সিস্টার-নিবেদিতার পুণ্য জীবন-কাহিনী অবলম্বনে—কিশোর কিশোরীদের অভিনয় উপযোগী নাটক।

ছড়ায় যাদুকর

ডক্টর বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য রচিত

রাম ফড়িংএর ছড়া ১·০০

যারা সবেমাত্র পড়তে শিখেছে, ডঃ ভট্টাচার্য্য কেবল তাদেরই জন্য লিখেছেন এই ছড়াগুলি। লিখবার সময় এর ছন্দ আর শব্দ-চয়নের কথা তিনি একেবারেই ভুলে যান নি। তাই পড়তে গেলে এত সুন্দর, এত চমৎকার লাগে এর প্রতিটি ছড়া। তাছাড়া বইটার পাতায় পাতায় আছে প্রখ্যাত শিল্পীর আঁকা নানারকমের জীব-জন্তু ও পশু-পক্ষীর অতি সুন্দর সুন্দর ছবি। ছবিগুলি দু-রঙে ছাপা আর প্রচ্ছদও ভারী সুন্দর—যা দেখলে, দুষ্টু ছেলেরাও এটাকে হাতে না নিয়ে পারবে না।

আশুতোষ লাইব্রেরী—৫, বংকিম চাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

STATEMENT ABOUT OWNERSHIP AND OTHER PARTICULARS ABOUT NEWSPAPER (Shishusathi) TO BE PUBLISHED IN THE FIRST ISSUE EVERY YEAR AFTER THE LAST DAY OF FEBRUARY

FORM IV

1. Place of Publication—5, Bankim Chatterjee St., Calcutta-12.
2. Periodicity of its publication—Once in a month.
3. Printer's Name—Ramkrishna Paul.
   Nationality—Indian.
   Address—5, Bankim Chatterjee St., Calcutta-12.
4. Publisher's Name—Ramkrishna Paul.
   Nationality—Indian.
   Address—5. Bankim Chatterjee St., Calcutta-12.
5. Editor's Name—Srimati Dasgupta.
   Nationality—Indian.
   Address—5, Bankim Chatterjee St., Calcutta-12.
6. Names and addresses of individuals who own the newspaper and partners or shareholders holding more than one per cent of the total capital—Brindabon Dhar & Sons, Private Ltd.
   5, Bankim Chatterjee St., Calcutta-12.

N. B.—Number of Share holdings subject matter of suit.

I, Ramkrishna Paul, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd. Ramkrishna Paul.

Date—13. 2. 69. Signature of Publisher.